দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৫ বর্ষ, ৩ সংখ্যা।। ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২।। ১৯ ভাদ্র - ১৪২৯
যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE NEW AGE PANELS
SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৯ ভাদ্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৫ সেপ্টেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

টেলিফোন নম্বর পালটে স্বেচ্ছানির্বাসনে মমতা! নরকের নজর ঘোরাতে 'নতুন তৃণমূল'
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

সম্পত্তি যার যার, উৎসব সবার ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

পরিবর্তনের শস্যবীজ আজ অঙ্কুরিত
◻ পীযূষ গোয়েল ◻ ৮

ঠেলায় পড়ে বিরোধীদেরও সম্বল এখন দেশপ্রেমের রাজনীতি ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

বিচারপতিকে আইনজীবীর আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

কলকাতার অপদার্থতার বলি উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্ররা
◻ সুদীপ্ত গুহ ◻ ১৩

সংখ্যালঘু-বান্ধব আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু কমে যাওয়া সম্প্রীতির চমৎকার দৃষ্টান্ত
◻ শিতাংশু গুহ ◻ ১৬

পুজো এলেই বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য ভয় হয়
◻ রাহুল দাস ◻ ১৭

বাঙ্গালি শিক্ষকদের এরকম অপমান আগে কেউ করেনি
◻ বিশ্বপ্রিয় দাস ◻ ২৩

ঘুষ দিয়ে যারা শিক্ষক হয়েছেন, তারা কি স্কুলে পড়ানোর যোগ্য? ◻ ভবানীশঙ্কর বাগচী ◻ ২৫

ইতিহাসের সিলেবাসে ব্রাত্য রাজা গণেশ
◻ সূর্য শেখর হালদার ◻ ৩১

কলকাতার ইতিহাস ও সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীনাথ
◻ রক্তিম দাশ ◻ ৩৩

ঋষি অরবিন্দের জীবন ও দর্শন ◻ পিন্টু সান্যাল ◻ ৩৫

আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল উদাহরণ ব্রহ্মোস মিসাইল
◻ দিব্যেন্দু বটব্যাল ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ **অঙ্গনা** : ২১ ◻ **সুস্বাস্থ্য** : ২২ ◻ **সমাবেশ সমাচার** : ২৮-৩০ ◻ **রঙ্গম** : ৩৯ ◻ **নবাঙ্কুর** : ৪০-৪১ ◻ **অন্যরকম** : ৪৬ ◻ **সংবাদ প্রতিবেদন** : ৪৭-৪৮

প্রকাশিত হবে
১২ সেপ্টেম্বর
২০২২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রকাশিত হবে
১২ সেপ্টেম্বর
২০২২

যা দেবী সর্বভূতেষু....

দুর্গাপুজো এসে গেল। পুজো আসার আগে একটি বিশেষ দিন আসে যা পুজোর কথা আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। সেই বিশেষ দিনটি হলো মহালয়া। এদিন বাঙ্গালি ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে রেডিয়োটি নিয়ে বসে পড়ে। বেতার তরঙ্গে ভেসে আসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গমগমে কণ্ঠস্বরে চণ্ডীপাঠ, যা দেবী সর্বভূতেষু...। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে মহালয়া নিয়ে স্মৃতিচারণ। লিখবেন সুজিত রায়, নন্দলাল ভট্টাচার্য, নিখিল চিত্রকর প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

With Best Compliments from :-

A

Well Wisher

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্ষকই ভক্ষক

শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হইয়া থাকে। শিক্ষা হইতে বঞ্চিত জাতিকে পঙ্গুত্ব গ্রাস করিয়া তাকে। ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষার অধিকারকে অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার দ্বারা মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার বোধ জাগ্রত হইয়া থাকে। বলা হইয়া থাকে যে, কোনো জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইলে পারমাণবিক হামলা অথবা ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন নাই; তাহাদের শিক্ষক ও ছাত্রকুলকে প্রতারণার সুযোগ করিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে। দেশের উন্নয়নের মাপকাঠিতেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিহার্য। ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস রহিয়াছে। শিক্ষকতাকে এই দেশে মিশন বা ব্রত হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। কখনোই প্রফেশন বা চাকুরি হিসাবে দেখা হয় নাই। ব্রতধারী শিক্ষকদের নিকট হইতে বিদ্যার্থীরা যে জ্ঞান আহরণ করিতেন, তাহা এক প্রজন্ম হইতে পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানের শিক্ষানীতিতেও তাহার প্রতিফলন দেখা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, রাজনীতির জাঁতাকলে পড়িয়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রা শুরু হইয়াছে বহু পূর্বেই। বর্তমান রাজ্য সরকারের আমলে আসিয়া তাহার প্রাণবায়ু নির্বাপিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। জাতি গঠনের কারিগর হিসাবে যাহাদের নিয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদের সিংহভাগই অশিক্ষিত অথবা অযোগ্য। তাহাদের বহু জনই শিক্ষকতার যোগ্যতা মানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পর্যন্ত হইতে পারেন নাই। এই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ না করিয়া মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে অশিক্ষিত ও অযোগ্যদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করিয়াছেন। আদালতের তত্ত্বাবধানে তদন্ত হইবার পর পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী, পরবর্তীতে শিল্পমন্ত্রী কোটি কোটি টাকা-সহ গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে দিনযাপন করিতেছেন।

মৌলিক অধিকার হইলেও আমাদের দেশে ২০০৯ সালে শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হইয়াছে। ১৩ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে চলিলেও প্রশ্ন উঠিয়াছে, সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার কি নিশ্চিত করা হইয়াছে? প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই প্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কোথায়? উত্তর সন্তোষজনক নহে। এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার বেহাল অবস্থার নানান দিক লইয়া প্রশ্ন তুলিয়া আদালতে একটি মামলাও দায়ের হইয়াছে। দেশের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের নিকট তাহার উত্তর জানিতে চাহিয়াছে। শিক্ষামহলের একাংশ বারবার অভিযোগ করিয়াছে রাজ্যে শিক্ষাব্যবস্থার হাল মোটেই সদর্থক নহে, তাহার উপর শিক্ষক নিয়োগ লইয়া রাজ্য সরকারের পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী এবং পর্ষদকর্তাগণ শিক্ষক নিযোগে যেইভাবে পুকুর চুরি করিয়াছেন তাহাতে দেশের নিকট এই রাজ্যের মান সম্মান ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে। প্রকৃত শিক্ষক পদ প্রার্থীদের ধরনা, ক্ষোভ,বিক্ষোভ ও হতাশা রাজ্যে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তা ও লজ্জার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সবচাইতে লজ্জার বিষয় হইল, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী হইতে শুরু করিয়া তাহাদের ছাত্র সংগঠনও চোরেদের বাঁচাইবার দাবিতে রাস্তায় নামিয়া মিছিল করিতেছেন। সমস্তরকম লজ্জার মাথা খাইয়া শাসকদলের এক সাংসদ হুমকি পর্যন্ত দিয়াছেন যে, তাহাদের চোর বলা হইলে এলাকা ছাড়া করা হইবে। দুর্নীতির পাঁকে অবগাহন করিতে করিতে তাহারা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নে নজর দেওয়ার সময়ই পান নাই। সূত্রের খবর, ২০১২ সালের তুলনায় বর্তমান সময়ে সাতহাজারের বেশি বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তবে, আশার কথা হইল, এই রাজ্যের বিচার ব্যবস্থায় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ন্যায় ঋজু মেরুদণ্ডের বিচারপতি রহিয়াছেন। আদালতের নির্দেশে রাজ্যের এক মন্ত্রীর কন্যাকে অবৈধভাবে নিয়োগের জন্য শিক্ষকতার চাকুরি খোয়াইতে হইয়াছে। আদালতের নির্দেশে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকগণ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় নথি নিজেদের দপ্তরে তলব করিয়াছেন। শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীদের মনে রাখিতে হইবে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত ছিনিমিনি খেলিবার অধিকার তাহাদের নাই। ইহার জবাব তাহাদিগকে দিতেই হইবে। রাজ্যের মানুষেরও ভাবিবার সময় আসিয়াছে, এই রাজ্যে এখন রক্ষকই ভক্ষকে পরিণত হইয়াছে। আদালত শাসকদলের চোরেদের শাস্তি প্রদান অবশ্যই করিবে, কিন্তু রাজ্যবাসীকে নিজেদের ভাগ্য নিজেদেরই নির্ধারণ করিতে হইবে। ইহার জন্য চোরেদের রাজত্বের অবসান সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

সুভাষিতম্

ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাপমানে চ কুপ্যতি।

ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রুয়াৎ স বৈ সাধুত্তমঃ স্মৃতঃ।।

যিনি সম্মানে অহংকার বোধ করেন না, অপমানে ক্রোধিত হন না, ক্রোধিত হলেও কঠোর বাক্য প্রযোগ করেন না, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধু।

টেলিফোন নম্বর পালটে স্বেচ্ছানির্বাসনে মমতা

নরকের নজর ঘোরাতে ‘নতুন তৃণমূল’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি তাঁর টেলিফোন নম্বর পালটে ফেলেছেন। সত্য মিথ্যা জানি না। তবে তৃণমূলের অন্দরে এই ধরনের কানাঘুসো শোনা যাচ্ছে। অত্যন্ত আস্থাভাজন গুটিকতক নেতা আর প্রশাসনিক ব্যক্তি ছাড়া সে নম্বর কেউ জানেন না। মমতা চাইলে তবেই যোগাযোগ সম্ভব। নচেৎ নয়। আর যদি এটা সত্য না হয় তাহলে বুঝব যে অন্যায় আর মন্দকে অগ্রাহ্য করার নির্বুদ্ধিতার ঘরে বাস করছেন মমতা।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর নিজের গ্রেপ্তারি মেমোতে মমতার নাম লিখেছিলেন। ছুঁচো গেলার অবস্থা মমতার। বেআইনি কাজের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তারি মেমোতে যদি মুখ্যমন্ত্রীর নাম লিখে তাঁকে চারবার টেলিফোন করে, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীও পরোক্ষভাবে সে অন্যায়ের সঙ্গে জড়িয়ে যান। পার্থবাবু জেনেবুঝেই তা করেছেন। তবে কেন, তা রহস্য থেকে গিয়েছে। আগামীতে তৃণমূলের অনেক নেতাই যে পার্থবাবুর মতো আটক বা গ্রেপ্তার হবেন তা দিনের আলোর মতো সত্য হয়ে উঠেছে। নিজের আর দলের ব্যাপারে সদাসতর্ক মমতা। উপায় নেই দেখে হয়তো কিছুদিনের জন্য একধরনের স্বেচ্ছানির্বাসন নিয়েছেন মমতা। তাছাড়া দলের দণ্ড এখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে, তাই মমতা নিজেকে সরিয়ে রাখছেন।

সারদা চিটফান্ড জালিয়াতিতে অভিযুক্ত সুদীপ্ত সেন তার চিঠিতে প্রসঙ্গান্তরে মমতার নাম লিখেছিলেন। সেন লিখেছিলেন কলকাতার একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠীকে তিনি ২০ কোটি টাকা ঋণ দেন, কারণ তারা দাবি করেছিল তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। তাই চিটফান্ডের ব্যবসা (যা বেআইনি) চালাতে সুদীপ্তবাবুর অসুবিধা হবে না। সবেমাত্র ক্ষমতায় আসা মমতা তখনকার মতো তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। এগারো বছরে মমতা বা তাঁর দলের বিরুদ্ধে বেআইনি কাজের অভিযোগ পাহাড়ের চূড়ো হয়ে গিয়েছে। মমতা তা কোনোভাবে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। তাই সতর্ক হয়ে গিয়েছেন।

তৃণমূলে এখন দুটি গোষ্ঠী -- রাজনৈতিক সচেতন আর হইহই গোষ্ঠী। প্রথম গোষ্ঠী হাড়ে মজ্জায় বুঝেছে কাঁটা পায়ের কোথায় বিঁধছে। সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। যথারীতি হইহই গোষ্ঠীর মস্তিষ্কে কোনো অক্সিজেন যায় না। তাই মমতা বা তার দল বিপদে পড়লে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা ভাড়াটে সৈনিক। মমতা হেরে গেলে আবার অন্য দলে ভাড়া খাটতে চলে যাবে।

আমার ধারণা দলীয় দুর্বিপাক আন্দাজ করেই হয়তো মমতা নিঃশব্দে সরে যাচ্ছেন। মোট কথা, এই মুহূর্তে ঝুঁকি নিতে রাজি নন মমতা। অনেকে বলছেন যে তদন্তের তির তাঁর দিকেও তাক করা রয়েছে। তাতে তদন্ত আটকানো বা রোখা যায় না। নতুন তৃণমূল বলে কিছু নেই। তৃণমূলের জোড়া ফুল— মমতা আর অভিষেক। অনেকবার লিখেছি, ‘অভিষেকহীন মমতা আর মমতাহীন তৃণমূল’ অস্তিত্বহীন।

অরাজকতা আর দুর্নীতির রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি নজর ঘোরানোর খেলা শুরু হয়েছে। কলকাতা আর রাজ্যজুড়ে ‘ছ’মাসে নতুন তৃণমূল’ বলে পোস্টার পড়েছে। অপাংক্তেয় খুচরো সমর্থকদের দিয়ে তা করানো হয়েছে। তৃণমূলি সংবাদপত্রগুলি তা নিয়ে ঢোল পেটাচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের বৃদ্ধাবাস ভেঙে বিদ্রোহের আকার নিয়েছে। সেই ধরনের আঁচ তৃণমূলেও পৌঁছাতে পারে সেটাই স্বাভাবিক। গোলাম নবি আজাদ-সহ কাশ্মীরের অনেক কংগ্রেস নেতাই দল ছেড়েছেন। আনন্দ শর্মা লাইনে রয়েছেন। তৃণমূলেও অভিষেকের টার্গেটে রয়েছেন বৃদ্ধরা। তথাকথিত নতুন তৃণমূলে তাদের ঠাঁই নেই। তবে এটা দেখার যে তৃণমূলের রাজনৈতিক দুর্বলতার কতটা ফয়দা নিতে পারে এ রাজ্যের প্রধান বিরোধীদল বিজেপি। অহেতুক বয়ানবাজি বন্ধ করলেই অনেকটাই রাজনৈতিক ফসল তুলতে পারবেন বিজেপি নেতারা। সুযোগ একবারই আসে। তার সদ্ব্যবহার না হলে সে আর ফেরে না। □

সম্পত্তি যার যার, উৎসব সবার

বড়ো একা দিদি,

আমি বড্ড ভয় পাচ্ছি। না, আমি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নই। আমার কোনও গোপন বান্ধবী নেই। গয়না দিইনি কাউকে। কোনও সংস্থা নেই। আমার নামে, বেনামে কোনও দেহরক্ষী নেই। তাই তাদের কোটি কোটি টাকার সম্পদও নেই। তবু ভয় পাচ্ছি। কারণ, আপনি যে কোনও দিন আমায় দূরে ঠেলে দিতে পারেন। আমি বুঝতে পেরে গেছি দিদি। আপনি বড়ো একা ভেবেই আপনার পাশে চিরকাল থাকতে চেয়েছি। কিন্তু এবার বুঝেছি আপনি কারও কেউ নন। আপনি শুধু আপনার। আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, সম্পত্তি যার যার, উৎসব শুধু সবার।

কেন বলছি? বুঝতে পারছেন না! এই তো সেদিন আপনি আপনার মায়ের পেটের ভাইদের সঙ্গেও দূরত্ব তৈরি করে ফেলেছেন। পার্থ, কেষ্ট, ববিরা কোন ছার, আপনি তো এখন নিজের ভাইদের সঙ্গেই কোনও সম্পর্কে নেই বলে দাবি করছেন। আপনি বলেছেন, 'রাজা দশরথ একা ছিলেন। তাঁর চার ছেলে হয়। রাম বিয়ে করে, লক্ষ্মণ বিয়ে করে। তাঁদেরও সন্তানাদি হয়। এভাবেই বংশ বাড়ে। আমরা ছিলাম ৬ ভাই ২ বোন। বাবা মারা যাওয়ার পর একমাত্র মা আমার কাছে ছিল। মাও মারা গিয়েছে। আমার ভাই বোনেরা সবাই নিজেদের মতো আলাদা আলাদা থাকে। আমরা সম্পর্ক রাখি উৎসবে উৎসবে। রাখিবন্ধনের সম্পর্ক রাখি, ভাইফোঁটার সম্পর্ক রাখি, কালীপুজোয় সম্পর্ক রাখি।'

কেন বলেছেন? কারণ, এখন আপনার পরিবারের লোকেদের সম্পত্তি নিয়েও মামলা জমা পড়েছে। তাতেই আপনি বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভাই আর ভাই নয়। ভাইফোঁটাতেই সম্পর্ক শেষ। তবে দিদি, আমি যদি কোনওদিন ভুল করেও কিছু করি আপনি তো আমার পাশেও থাকবেন না! দিদি, এটা আমার কথা বলছি না। আমি ভুল করার ছেলেই নই। আসলে আপনার অগণিত ভাই রয়েছে জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে। সেই দুষ্টু ছোটো ছোটো ছেলেরা অতীতে অনেক

আপনি বারবার বলেন যে, বই লিখে আপনি যা রয়্যালিটি পান তাতে আপনার খরচ চলে যায়। তবে দিদি আপনার ভোটের হলফনামায় রয়্যালিটি বাবদ কত টাকা রোজগার তার তো কোনও উল্লেখই নেই। আমি যতদূর জানি, রয়্যালিটি বাবাদ রোজগারে আয়কর দিতে হয়। সেটা দেন না নাকি!

ভুল করলেও আপনি 'ছোটো ঘটনা' বলে তাঁদের মাথায় হাত রেখেছিলেন। কিন্তু দিদি, এখন তাঁরা খুবই চিন্তায়। ভাবছেন, দিদি মায়ের পেটের ভাইদেরই দেখছেন না, তো আমরা কে! অনেকে এটাও ভাবছে, ভাইপোকে বাঁচাতেও কি আপনি ভাববেন, না কি তখনও বলবেন, ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই, সোনা-বউদিকেও কি আপনি পিসি শাশুড়ি হিসেবে পরিচয় দেবেন তখন?

আপনার পরিবারের সদস্যদের সম্পত্তি অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, এই অভিযোগে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়েছে। প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হতে পারে। সেটা শুনেই আপনি বলেছেন, 'এই শুনলাম, বিজেপি আমার নামে মামলা করেছে। আমি তো গত ১২ বছর ধরে এমপি হিসেবে যে পেনশন পাই, তা-ও নিই না। সাংসদ হওয়ার পরও কোনও দিন বিজনেস ক্লাসে যাত্রা করিনি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমার যে প্রাপ্য প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, তা-ও নিই না। আমি যেখানে থাকি, সেটাও ঠিকায় ভাড়া। আমার নিজের বলতে কিছুই নেই।' আচ্ছা দিদি, আপনি এই টাকাগুলো নেন না বলছেন, কিন্তু নিয়ম মেনে আপনার অ্যাকাউন্টে তো কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার জমা দেয়। সেগুলো কোথায় যায়? হিসেবটা দেবেন কখনও? আর আপনি দাবি করেছেন, আপনার বাড়ি লিজে নেওয়া। সেটাও ভোটের সময়ে দেওয়া হলফনামায় আপনি বলেননি। আর আপনি বিমানের বিজনেস ক্লাসে চড়বেন কেন? আপনার জন্য তো রাজ্য সরকারের পয়সায় চার্টার্ড বিমান ভাড়ায় নেওয়া রয়েছে।

শেষে একটা কথা দিদি। আপনি বারবার বলেন, বই লিখে আপনি যা রয়্যালিটি পান তাতে আপনার খরচ চলে যায়। তবে দিদি আপনার ভোটের হলফনামায় রয়্যালিটি বাবদ কত টাকা রোজগার তার তো কোনও উল্লেখই নেই। আমি যতদূর জানি, রয়্যালিটি বাবাদ রোজগারে আয়কর দিতে হয়। সেটা দেন না নাকি! □

অতিথি কলম

পীযূষ গোয়েল

পরিবর্তনের শস্যবীজ আজ অঙ্কুরিত

এক দেশ এক রেশন কার্ডের অর্থই হচ্ছে দেশের মানুষের বর্ধিত ক্ষমতায়ন। ভালো করে নজর করলেই দেখবেন ভারতব্যাপী এক বিশাল নীরব বিপ্লব সংগঠিত হয়ে চলেছে। ৮০ কোটি ভারতবাসী অদৃষ্টপূর্ব এক খাদ্য নিরাপত্তা পাওয়ার নিশ্চয়তায় ক্ষমতাবান। দেশের যে কোনো নাগরিক আজ দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে পর্যাপ্ত ভরতুকিপ্রাপ্ত চাল, ডাল প্রভৃতি বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য বস্তু কিনতে পারে। এগুলি ন্যায্য মূল্যের অর্থাৎ রেশন দোকানের মাধ্যমেই উপলব্ধ। এই পরিকল্পনা সরকারের লক্ষ্যকে এক ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় যে পরিবর্তন সুনিশ্চিত হতে চলেছে তা দেশবাসীর কাছে অকল্পনীয় ছিল।

এক জাতি এক রেশন কার্ড কেবল মাত্র এক গভীর ক্ষমতাসম্পন্ন ও সুযোগপ্রদানকারী প্রকল্প নয় যা এযাবৎ দারিদ্রসীমার আওতায় থাকা দেশবাসীকে এক কল্যাণকর উন্নয়নের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এর অন্যান্য প্রভাবের মধ্যে রয়েছে রেশন দোকানগুলির তীব্র প্রতিযোগিতার মুখোমুখী হওয়া। এর কারণ যে কোনো রাজ্যে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকেরা এখন যে কোনো রাজ্য থেকেই তাদের প্রয়োজনের খাদ্যবস্তু ও অন্যান্য জিনিসপত্র অনেক কমদামে কিনতে পারে। এতে তাদের প্রচুর অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে।

ভারতে ৬ কোটি লোক অন্য রাজ্যে কাজ করে আর ৮ কোটি মানুষ নিজের রাজ্যেই আসে ঋতুপরিবর্তনের (চাষবাসের কারণে) সময় বরাবর। 'এ দে এ রে কা' এই ক্ষেত্রে এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ওড়িশা, বিহার পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের পরিযায়ীরা এই প্রকল্পে বিশেষভাবে লাভবান হবেন।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার আগে এই সমস্ত রাজ্যগুলি থেকে যখন বিপুল পরিমাণ শ্রমিক ভিন্ রাজ্যে কাজে যেত তখন তাদের রেশন কার্ডগুলি দিয়ে তাদের কর্মস্থলের রাজ্যে গিয়ে এই ভরতুকিপূর্ণ রেশন ব্যবস্থার সুবিধে পেত না। তারা যদি আবার শহরাঞ্চলের কোনো দোকানের সঙ্গে যুক্ত থাকত সেক্ষেত্রে বাজার দরের থেকে অনেক বেশি দামে তাদের পরিবারকে মালপত্র কিনতে হতো।

কিন্তু 'এ দে এ রে কা' পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট শ্রমিক ও তার সমগ্র পরিবার অতি সহজেই এই সুবিধাভোগী হতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের টাকা অনেক বেশি পরিমাণে বাঁচতে পারে কেননা একদিকে তারা ভালো ভরতুকির রেশন (National food security Act) ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করা প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্নযোজনার (PM-GKAY) অধীনে বিনামূল্যে আরও কিছু জিনিসপত্র পায়। এই প্রকল্পের আওতাধীন থাকার ফলে ভারতীয় শ্রমশক্তি ক্রমশ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে, একই সঙ্গে প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর সর্বাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযানের' সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যাবে। এছাড়াও এই প্রকল্পের আরও সুদূরপ্রসারী কিছু ফলাফল রয়েছে।

(১) বহু দশক ধরেই বাড়ির কাছাকাছি থাকা রেশন দোকানগুলি সেই অঞ্চলের মানুষদের রেশন দেওয়ার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। মানুষের সেই নির্দিষ্ট দোকান ছাড়া অন্য কোথাও থেকে মাল নেওয়ার কোনো অধিকার ছিল না। দোকান মালিকদের যাকে বলে একেবারে বাঁধা খদ্দের ছিল। ভালো মাল সরবরাহ করার জন্য তাদের কোনো বাড়তি সুবিধে দেওয়া হতো না।

(৩) 'এক দেশ এক রেশন কার্ড' প্রকল্পের মাধ্যমে কেবলমাত্র পরিযায়ী প্রত্যেক

> **প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রয়োগের ফলেই বাস্তবে গরিব মানুষজন আজ ব্যাংক খাতার অধিকারী। সেই খাতায় কোনো দালাল ছাড়াই সরাসরি টাকা আসে। যা আগে ভাবাই যেত না।**

উপভোক্তাই তার পছন্দের যে কোনো দোকান থেকে অর্থাৎ যেখানে সে তুলনামূলকভাবে ভালো মাল বা ভালো ব্যবহার পেতে পারে সেখানেই যাবার অধিকারী।

(৩) রেশন দোকানগুলিকে দেশ জুড়ে ৫ লক্ষ দোকানের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। এটি একটি বড়ো ধরনের গুণগত পরিবর্তন যেখানে বিক্রেতাকে সর্বদা জিনিসের গুণগত মান সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে, না হলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল।

এই প্রতিযোগিতার আবহ তৈরি হওয়ার ফলে লক্ষ লক্ষ রেশন দোকান দেশের সামগ্রিক ব্যবসায়িক সংস্কৃতিতেই পরিবর্তন আনবে। এই পরিবর্তিত উন্নয়নের পরিস্থিতি অন্য ছোটো ছোটো কারবারীদেরও আরও বড়ো হওয়ার প্রেরণা জুগিয়ে রপ্তানি বাণিজ্যে যোগ দিতে উৎসাহিত করবে। পরিণতিতে বহু চাকরির সৃষ্টি হবে।

'এক দেশ এক রেশন কার্ড' ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ইতিবাচক সূচনা করেছে।

(১) কোটি কোটি শ্রমিক, দিনমজুর, শহুরে গরিব যেমন রাস্তার কাগজকুড়ানো লোকেরা, ফুটপাথবাসী, সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক বিশেষ করে বাড়ির কাজের লোকেরা এই যুগান্তকারী প্রকল্পের সুবিধে পাচ্ছে।

(২) ২০১৯ সালে প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৮০ কোটি লেনদেনের মিশ্রিত হিসেবে পাওয়া গেছে। এর ভেতরে রাজ্যের মধ্যে রাজ্যবাসীর বা ভিন রাজ্যের পরিযায়ীদের দেওয়া হিসেব দুটিই ধরা হয়েছে। একই সঙ্গে বরাবরের জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইনের মাল ও প্রধানমন্ত্রী 'গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা' দুটি প্রকল্পের সফল সংযুক্তীকরণ হয়েছে। উল্লেখযোগ্য এই ৮০ কোটি টাকা লেন-দেনের মধ্যে ৬৯ কোটি টাকাই ছিল এপ্রিল ২০২০ থেকে কোভিড পর্বের সময়কার হিসেব।

প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল লেন-দেনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে দেশ অনেক ক্ষমতাশালী হয়েছে। কোভিডের চূড়ান্ত সংক্রমণের সময় ডিজিটাল পদ্ধতিকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে work from home-এর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাইরের কাজ অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বহুক্ষেত্রে বাড়ি থেকেই করা হওয়ায় অর্থনীতিক্ষেত্র অনেক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পেরেছে। বর্তমানে শতকরা ১০০ ভাগ রেশন কার্ডই ডিজিটাইজড। এছাড়া ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিক্রির ব্যবস্থা ৫.৩ লক্ষ রেশন দোকানেই করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থাকে আরও কার্যকরী করে তুলতে সরকার সমস্ত রেশন প্রাপকই যাতে এই সুবিধে নিতে পারে তার জন্য বাড়তি ব্যবস্থা নিচ্ছে। এর মধ্যে খাদ্য ও জনবিতরণ বিভাগের তরফে 'common registration facility' পরীক্ষামূলকভাবে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে চালু হয়েছে। আরও বেশি সংখ্যক উপভোক্তাকে যুক্ত করার চেষ্টা চলছে।

কেন্দ্রের বহু মন্ত্রীর অধীনস্থ বিভাগ (ministries) ও বিভিন্ন দপ্তর তাদের কাজকর্মকে সুন্দর পারস্পরিক একসূত্রে বেঁধে সহযোগিতামূলক পদ্ধতিতে কাজ করছে। মানুষকে প্রকল্পগুলি সম্পর্কে পূর্ণ সজাগ করতে সব রকমের বিভাগীয় প্রচেষ্টা বিপুল তৎপরতায় এগিয়ে চলেছে। এই সূত্রে সরকার জনগণকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত রেডিয়ো মাধ্যমের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। হিন্দি-সহ আরও ১০টি প্রধান ভাষায় ১৬৭টি 'এফএম চ্যানেলে' ৯১টি গ্রামীণ ও বিবিধ সম্প্রদায়ের রেডিয়ো স্টেশনের মাধ্যমে সম্প্রচার চলছে। ২৪০০টি ভারতীয় রেলওয়ে স্টেশনে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পরিযায়ী শ্রমিক যারা সর্বাপেক্ষা বেশি রেল ভ্রমণ করে তাদের নজরে আনার জন্যই এই ব্যবস্থা। এমনকী বহু জনপরিবহণের বাসেও নজরে পড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে।

এই পরিকল্পনাটির মধ্যেই মোদী সরকারের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। আর বিগত ৮ বছরে দেশবাসী নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছে যে মোদী সরকারের নীতির সূচিমুখ সর্বদাই হচ্ছে গরিবের মধ্যে সবচেয়ে গরিবের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা। মানোন্নয়ন করা সমাজের, বনাঞ্চলবাসী প্রান্তিক, দীর্ঘসময় বঞ্চিত মানুষজনের। এই দর্শনই সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে সরকারের যাবতীয় নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে। যার ফল বিগত আট বছরে দেশে যে বিপুল পরিবর্তন হয়েছে তার মধ্যে প্রতিফলিত।

বলতে দ্বিধা নেই যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই দর্শনের প্রয়োগের ফলেই বাস্তবে গরিব মানুষজন আজ ব্যাংক খাতার অধিকারী। সেই খাতায় সরাসরি কোনো দালাল ছাড়াই টাকা আসে। আসে স্বাস্থ্য বিমার টাকা। আজ দেশের প্রতিটি ঘরে রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ, উচ্চমানের গ্রাম সড়ক রয়েছে একেবারে প্রত্যন্ত এলাকাতেও। কাঠ জোগাড় করে বা দূষণ ছড়ানো কয়লা এখন গরিব মানুষকে রান্নার কাজে ব্যবহার করতে হয় না। স্বাধীনতার এই ৭৫ বছরে সরকার দেশের সমস্ত মানুষকে আরও বেশি স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছে। দিয়েছে পছন্দের স্বাধীনতা। আসুন একে উদ্‌যাপন করি।

(লেখক ভারত সরকারের টেক্সটাইল দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী)

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কাঁথি জেলার সেবা টোলির সদস্য তথা মুগবেড়িয়া খণ্ডের সেবাপ্রমুখ গোপাল ষড়ঙ্গীর মাতৃদেবী সন্ধ্যারানি ষড়ঙ্গী গত ২৬ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি ২ পুত্র ও ১ নাতিকে রেখে গেছেন।

পাত্র চাই

পাত্রী সাধুখাঁ পঃ বঃ শান্তিপুর 51 বঃ+ 5' 2" মধ্যমবর্ণা, সুশ্রী, সঙ্গীতজ্ঞা, জমি-সহ নিজ বাড়ি, সঃ / অসঃ, সঙ্ঘ অনুগামী উপযুক্ত পাত্র অগ্রগণ্য।

যোগাযোগ — গৌর চন্দ্র গড়াই, চুঁচুড়া

ফোন - 9836304624

ঠেলায় পড়ে বিরোধীদেরও সম্বল এখন দেশপ্রেমের রাজনীতি

সম্প্রতি ভারত-পাকিস্তানের একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ভারতের জয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শাহ জনৈক ভারতীয় সমর্থকের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা নিতে নাকি অস্বীকার করেছেন, তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। ঘটনাচক্রে জয় শাহ হলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র। তাই বিরোধীরা, তাঁদের মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আছেন; তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সভামঞ্চ থেকে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন তিনি, যে সরকার হর-ঘর-তেরঙ্গা উদ্যাপন করেছে, সেই সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে জাতীয় পতাকা নিতে কীভাবে অস্বীকার করেন? অভিষেক শ্লেষের সঙ্গে এও বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তাঁর পুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করা উচিত ইত্যাদি।

একথা অস্বীকারের বিন্দুমাত্র উপায় নেই যে অমিত শাহের পুত্র বলেই ঘটনাটি নিয়ে এত বিতর্ক হচ্ছে, অন্য কারোর ক্ষেত্রে হলে এই পরিমাণ বিতর্ক অন্তত হতো না। এবিষয়ে আমাদের বক্তব্যে আসার আগে দেখে নেওয়া যাক ঘটনাটা ঠিক কী ঘটেছিল।

ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োয় দেখা যাচ্ছে, সবাই তখন ভারতীয় ক্রিকেট দলের জয় উদ্যাপনে আনন্দ করছেন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহও আনন্দে আত্মহারা। খুশিতে মশগুল হয়ে হাততালি দিচ্ছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে জনৈক ব্যক্তি তাঁর দিকে জাতীয় পতাকা বাড়িয়ে দেন। জয় শাহ তা বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। কেন জয় শাহ ভারতীয় পতাকা হাতে নিলেন না? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জয় শাহ যেমন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড বিসিসিআইয়ের সচিব, আবার একইভাবে এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতিও। যেহেতু এশিয়ার দুই দেশের মধ্যে খেলা; তাতে কোনো দেশের জাতীয় পতাকা এশিয়া ক্রিকেট কাউন্সিলের সভাপতি নিলে তিনি পক্ষপাতদুষ্ট বলে চিহ্নিত হতে পারতেন। তাই তথ্যাভিজ্ঞমহলের মতে, নেহাত আচরণবিধি (প্রোটোকল) রক্ষার খাতিরেই জয় শাহ জাতীয় পতাকাটা হাতে তুলে নিতে চাননি। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে তিনি জাতীয় পতাকা হাতে নিতে অস্বীকার করেছেন, এই কদর্য ব্যাখ্যায় ভারতীয় রাজনীতির মানটাই যে কত নীচুতে নেমেছে তার প্রমাণ দেয়।

মনে রাখতে হবে, দেশপ্রেম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আর এই প্রবৃত্তি থেকে ভারতবাসী যাতে বঞ্চিত থাকেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্রিটিশ ভারত-ত্যাগের আগে শুধু দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করেই ক্ষান্ত হয়নি, ভারতের রাজ্যপাট পরিচালনার ভার তাদের অনুগত ভারতীয় সৈনিকের হাতেই দিয়ে গিয়েছিল। এবং তিনি তাঁর পরিবারের শাসন কায়েম করে ভারতের প্রকৃত ইতিহাস ভোলানোর কাজটি করে গিয়েছিল। তাই কেন্দ্রে ২০১৪ সালে যখন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে এনডিএ সরকার ক্ষমতায় এল, তখন দেশকে পরিবারতন্ত্রের অভিশাপ- মুক্তির পাশাপাশি দেশের মানুষের মনে দেশপ্রেম সঞ্চারের কাজেও তাদের মনোযোগ দিতে হয়েছিল। এবং তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জয় শাহের উল্লিখিত ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি হলেও বা ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা হলেও দিনের শেষে রাজনীতিটা আবর্তিত হলো দেশপ্রেমকে কেন্দ্র করে। রাজনীতির অভিমুখ বদল করার এই কৃতিত্ব, স্বীকার করতে কোনো অসুবিধে নেই, একান্তভাবেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের। অনেকের স্মরণে থাকতে পারে কিছুদিন আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর তিন বিভাগের প্রধানের (চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ) মৃত্যুতে মুসলমান সমাজের একাংশের মজা, ইয়ার্কি ইত্যাদির প্রতিবাদে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র- পরিচালক আলি আকবর সস্ত্রীক ইসলাম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুতরাং ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে সকলেই ভারতবাসী, দেশের প্রতি অনুরাগের তীব্রতা, জাতীয়তাবোধ-চেতনা ভারতবাসী মাত্রেরই বৃদ্ধি পেয়েছে গত আটবছরে। সুতরাং রাজনীতির কারবারিরাও এতকালের চেনা ছকের বাইরের রাজনীতি দেখে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থেই দেশপ্রেমের রাজনীতি আমদানি করতে চাইছে। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে, বেশ কিছুকাল আগে একবার বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ভারত জেতায় এদেশের সমর্থকদের উন্মাদনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। এক সাংবাদিক কলকাতার উলটোডাঙার মোড়ে তাঁদের উদ্দেশে শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করলে, ভারতীয় সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সেই সাংবাদিক পরদিন কাগজে উত্তর সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখে ফেলেছিলেন— এখনো পাকিস্তান জিতলে আমাদের দেশে কোথাও কোথাও মুসলমান জনবহুল এলাকায় পটকা ফাটানো হয়।

এই প্রবণতা এতকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার অজুহাতে মান্যতা পেয়ে এসেছে। মনে থাকতে পারে, এই কিছুদিন আগে, দেশবাসীকে সুসংহত রাখার জন্য, মনোবল বৃদ্ধির জন্য, একদেশ চেতনা বৃদ্ধির জন্য মোদী সরকার যখন কোভিড পরিস্থিতিতে একের পর এক কর্মসূচি নিচ্ছিল, সেই মুহূর্তে একে অবৈজ্ঞানিক ইত্যাদি বলে বিরোধীদের সম্মিলিত কটাক্ষের কথা। কিন্তু দেশের স্বার্থ নিয়ে যে সর্বত্র তামাশা চলে না, আলি আকবর তার প্রমাণ কিছুদিন আগেই দিয়েছেন। বিরোধীদের মুশকিল হলো, দেশের স্বার্থ নিয়ে যে রাজনীতি চলে না স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরেও এই বোধ তাঁদের জাগ্রত হয়নি। কিন্তু জাগ্রত জনতা তাঁদের বাধ্য করছে। এতকালের চিরাচরিত অভ্যাস পালটে দেশের স্বার্থে কথা বলতে, দেশপ্রেমের কথা বলতে। এটা মেকি, নিতান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, ঘোলা জলে মাছ ধরবার তাগিদে হলেও রাজনীতির অভিমুখ যে বদলেছে তা টের পাওয়া যায়। আর এখানেই মোদী সরকারের সাফল্য।

বিচারপতিকে আইনজীবীর আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

কয়েকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটে গেছে তা শুধু রাজ্য বা দেশ নয়, সমগ্র বিশ্বের কোনও দেশে এরকম ঘটনা ঘটেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে। ঘটনাটা যিনি ঘটিয়েছেন তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একজন বর্ষীয়ান এবং প্রথম সারির আইনজীবী— অরুণাভ ঘোষ। তিনি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভরা এজলাসে বিচারপতিকে যেভাবে অপমান করেছেন এবং হুমকি দিয়েছেন তা এই বাঙ্গলায় তথা দেশের বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে এক কলঙ্কজনক অধ্যায় রচনা করল। তিনি বিচারপতির উদ্দেশে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তার সবগুলি এখানে উল্লেখ করা সমীচীন মনে করলাম না বা লজ্জায় তা উল্লেখ করতে পারলাম না। মাত্র দুটি বাক্য উত্থাপন করলাম।

আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন--- 'আপনি আইন জানেন না।' আরও বলেছেন— 'আমি কীভাবে ডিল করতে হয় জানি।' ভাবুন একবার। একজন আইনজীবী পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকে কোথায় টেনে নামাচ্ছেন। কোনো আইনজীবীর কোনো বিচারকের সঙ্গে মতে নাও মিলতে পারে, তাই বলে একজন আইনজীবী কি কখনও ভরা এজলাসে বিচারককে যা খুশি তাই বলে আক্রমণ করতে পারেন? আইনে কী বলা আছে তা আমার জানা নেই, কারণ আমি আইনজীবী নই। তবে সাধারণ বুদ্ধিতে এটুকু বুঝতে পারি যে, সম্মানের দিক থেকে একজন আইনজীবীর চেয়ে একজন বিচারকের মান ও মর্যাদা অনেক উঁচুতে। বিশেষ করে বিচারক যখন এজলাসে আইনের আসনে উপবিষ্ট থাকেন।

শুধু অরুণাভ ঘোষ নন, তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন আইনজীবী এই মত সমর্থন করেছেন। বিপরীত দিকে শাসক বিরোধী কিছু আইনজীবী অরুণাভ ঘোষের নিন্দা করেছেন। অরুণাভ ঘোষ রাজনীতিক হিসেবে কংগ্রেসী মতাদর্শে বিশ্বাসী। অথচ তিনি তৃণমূলের যারা চুরির দায়ে জেলে ঢুকেছেন বা আরও অনেকের জেল যাত্রা ত্বরান্বিত করার জন্য বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় যেভাবে ইডি-সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন তাতেই ঘোষবাবুর আঁতে ঘা লেগেছে। এতে মনে হচ্ছে তিনি হয়তো রাজনৈতিক মতাদর্শ পরিবর্তন করে শাসকের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিতে চাইছেন, নয় তো প্রচারের আলোয় আসার জন্য বিচারপতিকে আক্রমণ করলেন। তাঁর এই আক্রমণ কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় বিচার ব্যবস্থাকে যেভাবে সক্রিয় করে তুলেছেন তাতে অপরাধীরা শঙ্কিত। তাই তারা দিশেহারা। এক্ষেত্রে দেখে নেওয়া যাক বিচারপতি অভিজিৎবাবু সম্পর্কে কিছু তথ্য এবং তিনি কীভাবে অপরাধীদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছেন। একের পর এক মামলায় যাঁর পর্যবেক্ষণ বিস্মিত করেছে সমাজের বিদ্বজ্জন থেকে সাধারণ মানুষকে শিক্ষকের চাকরি পরীক্ষায় পাশ করেও যখন দীর্ঘদিন আন্দোলন করে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলেন চাকরিপ্রার্থীরা, ঠিক তখনই বিপদ থেকে উদ্ধারকর্তা হিসেবে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর নির্দেশ চাকরি প্রার্থীদের মনেও ফের আশার আলো জ্বালতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দুই হেভিওয়েট নেতা-মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ অধিকারীকে সিবিআই জেরার মুখে ফেলে অঙ্কিতার চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেয়। ববিতাকে চাকরিতে নিয়োগ করিয়ে এবং গোরু পাচারকাণ্ডে অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে তিনি এখন 'জনতার বিচারপতি।' বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আদালতের প্রতি মানুষের হারিয়ে যাওয়া আস্থা ফিরিয়ে এনেছেন বলে মনে করছেন এসএসসি-র চাকরিপ্রার্থী থেকে বহু সাধারণ মানুষ এবং সামাজিক মাধ্যমের

> “অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় প্রতিটা মুহূর্তে দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করেছে। ও যেসব সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আমি বিস্মিত। ও যে এতটা সাহসী বিচারপতি হবে, তা আইনজীবী থাকার সময় বুঝতে পারিনি। ও যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা অভাবনীয়।”

ফঃ ২

নেটিজেনরা।

শ্রী গঙ্গোপাধ্যায়ের কর্মজীবন শুরু সরকারি চাকরি দিয়ে, তবে তা বেশিদিন নয়। পরে আইন নিয়ে পড়াশোনা করে ১০ বছর তিনি আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন। সেই সময় ন্যাশনাল ইন্সিওরেন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ মামলাও লড়েন। ২০১৮ সালের ২ মে কলকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তিনি। ২০২০ সালের ৩০ জুলাই থেকে হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে কাজ শুরু করেন। ২০২১ সাল থেকেই পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন দুর্নীতি মামলায় একের পর এক নির্দেশ দিতে থাকেন। নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতাকে স্কুল শিক্ষিকার চাকরি থেকে বরখাস্ত করার আদেশ দেন। সেইসঙ্গে ৪১ মাসের বেতনের টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেন। শুধু এসএসসি মামলা সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়াই নয়, পরেশ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতো দাপুটে মন্ত্রীকেও বেকায়দায় ফেলে দেয় তাঁর রায়।

৭৬ বছরের বৃদ্ধা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্যামলী ঘোষকে ২৫ বছরের বকেয়া বেতন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। সেদিনের সেই রায় শুনে এজলাসেই আনন্দের কান্নায় ভেঙে পড়েন শ্যামলী দেবী। দু' হাত তুলে আশীর্বাদ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়কে। ক্যানসার আক্রান্ত শিক্ষিকার ১২ দিনের বেতন কেটে নেওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষকের পদ কেড়ে নিয়েছিলেন। ওই শিক্ষিকার বকেয়াও দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। আন্দোলনরত ক্যান্সার আক্রান্ত সোমাকে ব্যক্তিগতভাবে ডেকে পাঠিয়ে বিকল্প চাকরির প্রস্তাবও দেন তিনি। ফলে, এসএসসি আন্দোলনকারীদের অনেকেই জেলায় জেলায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টারও দেয় তাঁর নামে। বেকার যুবক-যুবতীদের এখন নয়নের মণি বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায়ের এহেন রায়দান ও জনপ্রিয়তায় হতাশ হয়ে তাঁকে চাপে ফেলতে তাঁর ঘরের বাইরে ধরনাও দেন শাসক দলের আইনজীবীরা। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর এজলাস বয়কটের ডাক দেয় কলকাতা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশন। যার জন্য রাজ্যপাল জগদীশ ধনকর চিঠি লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় চাপের মুখে মাথা নত করেননি বরং হুংকার দিয়ে বলেন, 'মাথায় বন্দুক ধরে মারতেও পারেন, তবু মরতে রাজি। কিন্তু দুর্নীতি দেখলে চুপ করে থাকব না। আওয়াজ তুলবই।'

এক এক সময়ে এক এক রকম পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে তাঁর উদাহরণস্বরূপ মন্তব্য। তিনি বলেছেন, 'পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্রী থাকা উচিত কিনা সেটা খতিয়ে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল।' আবার তিনি হুংকার দিয়ে বলেছেন, 'সুযোগ থাকলে গান্ধী পরিবারের সম্পত্তিরও হিসেবে চাইবেন।' ঠাকুরপুকুরের এক শিক্ষিকা দীর্ঘদিন চাইল্ড কেয়ার লিভের বকেয়া আটকে থাকায় বেতন পাচ্ছিলেন না। হাইকোর্টের অন্য বেঞ্চের নির্দেশের পরেও সুরাহা হয়নি। কিন্তু বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চের নির্দেশে ২০ দিনের মধ্যে সবকিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তাঁর এই ভূমিকায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'উনি বেকার যুবকদের জন্য, আর এই বিরাট দুর্নীতিকে ভাঙতে যা করছেন, তাতে আমার রাজনৈতিক পরিচয় দূরে সরিয়ে রেখে বাঙ্গলার একজন নাগরিক হিসেবে এই জাস্টিসকে প্রণাম জানাচ্ছি।' একইভাবে সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব হলো, তিনি প্রথম বলটাই বাউন্ডারি লাইনের ওপারে পাঠিয়েছেন। এখন সবাই বুঝতে পারছে, এই বলটায় বাউন্ডারি মারা যায়।' তৃণমূল আমলের রাজ্যের দ্বিতীয় অ্যাডভোকেট জেনারেল বিমল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'অভিজিৎ আমার জুনিয়র। প্রতিটা মুহূর্তে দায়িত্ববোধের সঙ্গে কাজ করেছে। ও যেসব সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আমি বিস্মিত। ও যে এতটা সাহসী বিচারপতি হবে, তা আইনজীবী থাকার সময় বুঝতে পারিনি। ও যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে তা অভাবনীয়।'

বিজেপি বিধায়ক ও সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী অম্বিকা রায় বলেছেন, 'দুর্নীতি মামলায় আদালতের সক্রিয়তা অনেক বেড়েছে গত দশ বছরের তুলনায়। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের একের পর এক পর্যবেক্ষণ জুডিশিয়ারিকে অ্যাকটিভ করে তুলেছে। এ কারণে সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরে এসেছে আইনের প্রতি। মামলাগুলি দীর্ঘসূত্রিতা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। অন্য মামলাগুলি দেখে মনে হচ্ছে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের এ ধরনের রায় ও পর্যবেক্ষণ অন্য বিচারপতিদেরও উৎসাহিত করছে বলেই আমার মনে হচ্ছে।'

দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াই করা এহেন বিচারপতির বিরুদ্ধে অশ্লীল মন্তব্য কোনোমতেই মেনে নেওয়া যায় না। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় এখন রাজ্যবাসীর কাছে বহু চর্চিত একটি নাম। তাঁর সাহসিকতা এবং সঠিক সিদ্ধান্তই সুযোগসন্ধানীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। □

With Best Compliments from -

A

Well wisher

কলকাতার অপদার্থতার বলি উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্ররা

সুদীপ্ত গুহ

জাতীয়করণের নেশা এবং ভুল রাজনৈতিক তত্ত্ব কীভাবে একটা সোনার ডিমপাড়া হাঁসকে শেষ করে দিতে পারে, তার উদাহরণ উত্তরবঙ্গ। এই ভূখণ্ডের অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে যদি যেতে হয়, তাহলে বাংলা উপন্যাস চৌরঙ্গীর কথা স্মরণ করতে হবে। ষাটের দশকের ভারতের অন্যতম অর্থ ও বাণিজ্য কেন্দ্র ধ্বংস হওয়ার কারণ গল্পের মাধ্যমে চৌরঙ্গী উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। পরে উত্তমকুমার, উৎপল দত্তদের নিয়ে একটি ছায়াছবিও বানানো হয়। ছবিতে হোটেলের বিদেশি মালিক দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর হোটেল বিক্রি করে চলে গেলে, নতুন দিশি মালিকরা কর্মীদের অধিকাংশকে ছাঁটাই করেন এবং বাকিদের দুর্দশা বাড়তে থাকে। হোটেল মালিক মার্কোপোলো কেনিয়ায় চলে যান এবং নিজের নতুন ব্যবসায় নিয়োগ করেন স্যাটা বোস তথা উত্তমকুমারকে। ঠিক এই ঘটনা ১৯৬৬-তে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এলে দেশের তথা পশ্চিমবঙ্গের সব শিল্পে ঘটে। ডানলপ, শাওয়ালস থেকে গ্রামাফোন, পাট শিল্প, বস্ত্রশিল্প সর্বত্র। উত্তরবঙ্গের চা শিল্প এর সবচেয়ে বড়ো শিকার। সঙ্গে ভেঙে পড়তে থাকে উত্তরবঙ্গের ব্যবসা, অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা। শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা হয় পরিযায়ী। বহু শহর বৃদ্ধাশ্রম হয়ে যায়। শুরু হয় নকশাল আন্দোলন। চা-বাগানের শ্রমিকদের ক্ষোভ এবং কলকাতা শিল্পাঞ্চলের শিক্ষিত বেকারদের ক্ষোভ যার মূলে।

এখন ১৯৬৬-তে কী ঘটেছিল সেটা বোঝা দরকার। নেহরু বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিমালিকানার সহাবস্থানে। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসেই ব্যক্তি মালিকানা মোটামুটি তুলে দিয়ে লাইসেন্স রাজ এবং কোটা রাজের আরও বাড়বাড়ন্ত শুরু করলেন। অধিকাংশ চা-বাগান ছিল ব্রিটিশদের। তারা বুঝলো ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো সিস্টেম চালু হতে চলেছে। ভারত সরকার তখন FERA আইন আনার পরিকল্পনা করছে, যে আইনে আগামীদিনে রপ্তানি-আমদানি বেশ কঠিন হয়ে উঠতে চলেছে। বাড়তে চলেছে কর্পোরেট কর। অধিকাংশ চা-বাগানের মালিক দেশি ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবার পরিকল্পনা করলো তাদের চা-বাগান। কিনলো কিছু অসৎ ব্যবসায়ী। এখন প্রশ্ন, কেন 'অসৎ' বলছি?

এই চা-বাগান কিনতে হলে দিল্লি থেকে লাইসেন্স নিতে হতো যার জন্য বাবু ও নেতাদের বহু টাকা পারিতোষিক দিতে হতো। আর চা-বাগান হাতে পেয়ে এই নেতা ও বাবুদের প্রতিনিধি ব্যবসায়ীরা যথেচ্ছভাবে আইন ভাঙতে শুরু করলো। শ্রমিক আইন, পরিবেশ আইন থেকে আর্থিক আইন— সব ভাঙতে শুরু করলো তারা। এর মধ্যে ব্যাংক জাতীয়করণ হাওয়ায় দুর্নীতির পরিমাণ আরও বাড়লো। কীভাবে একে একে ব্যাখ্যা করা যাক।

চা-বাগানে ছয় মাস কোনো কাজ থাকে না। কিন্তু ব্রিটিশরা দেশের আইন মেনে শ্রমিকদের পুরো বছরের মাইনে, বোনাস ইত্যাদি সব দিত। কর্মীরা ছিলেন স্থায়ী কর্মী। কিন্তু নতুন লাইসেন্সধারী দেশি ব্যবসায়ীরা এই ছয় মাস মাইনে দেওয়া বন্ধ করার ফন্দি আটলো। শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েই কখনো লক আউট, কখনো হরতাল ডেকে ছয় মাসের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দিল। রাতারাতি স্থানীয় উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনের মান এক ধাক্কায় নেমে এলো। ক্রমশ তাদের জীবনযাত্রার মান নামতে শুরু করলো। সঙ্গে শুরু হলো ছায়া গাছ কেটে ফেলা। এই গাছের ছায়া চা-গাছের উপর পড়লে চায়ের গুণমান ভালো হতো। দেশি মালিকরা রাতারাতি সেইসব গাছ কেটে প্রচুর পয়সা কামিয়ে নিল। রাতারাতি নেমে গেল চায়ের গুণমান ও স্বাদ। কিছু ব্যবসায়ীর লোভ এতো বাড়লো যে পুরো চা-গাছের সব পাতা কেটে ফেলল। কিন্তু এই গাছ জন্মাতে লাগে ৫০ বছর। ফলে বাগানের পর বাগান শেষ হয়ে গেল। খেলা এখানেই শেষ না। কিছু ব্যবসায়ী চা-বাগান ব্যাংকের কাছে বন্ধক রেখে টাকা তুলে সেই টাকা সরিয়ে ফেলল। একদল অসৎ ব্যাংক অফিসার, বাবু ও নেতারা এই কাজে তাঁদের সাহায্য করল। ফলে জমি হয়ে গেল ব্যাংকের। এবার আদালতের চক্করে চাষের বাজলো বারোটা। অন্যদিকে সেই ব্রিটিশরা কেনিয়ায় গিয়ে নতুন করে পাহাড়ি জমি কিনে চা চাষের পরিকল্পনা করে। ৫০ বছর ধৈর্য ধরে এবং আজ ভারতে তাদের চা বিক্রি করছে। ফলে স্থায়ীভাবে বাজার হারালো আমাদের দার্জিলিং চা।

এরপরে মার খায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্রিটিশ মালিকরা তাদের পাওনাদারদের সঠিক সময়ের পাওনার টাকা দিয়ে দিত। ENFORCEMENT OF CONTRACT মেনে চলত তারা। নতুন মালিকরা আসার পরে এই ব্যাপারটা প্রায় উঠেই গেল। দুর্বল বিচার ব্যবস্থার পুরো সুযোগ নিয়ে ঠকাতে শুরু করলো স্থানীয় ব্যবসায়ীদের। নিজের আত্মীয়স্বজনদের ব্যবসায় আনার জন্য, পুরোনো ব্যবসায়ীদের পাওনা বহুদিন আটকে রাখা শুরু হলো। বাঙ্গালি ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে ব্যবসা ছেড়ে দিতে থাকল এবং পরের প্রজন্ম চাকরি নিতে শুরু করল। এককথায়, দার্জিলিং চা-শিল্প সর্বনাশের পিছনে ইন্দিরা গান্ধীর কট্টর জাতীয়করণ নীতি, বাবু ও নেতাদের দুর্নীতি, অসৎ ব্যবসায়ীদের ষড়যন্ত্র এবং ট্রেড ইউনিয়ন। শেষ পেরেক এল তৃণমূল সরকারের থেকে, যার সমাধান তো দূরের কথা, সমস্যার কারণই জানা নেই। শুরু হলো ডোল রাজনীতি। সমস্যা আরও বাড়লো।

এমন অবস্থায় কৃষিপ্রধান উত্তরবঙ্গকে বাঁচাতে পারতো তিস্তা প্রকল্প। এই প্রকল্প সম্ভবত ভারতের প্রথম নদী সংযুক্তীকরণ প্রকল্প, যেখানে জলঢাকা, তিস্তা, মহানন্দা, ডাউক, নগর ও টাঙন নদীকে যুক্ত করে উত্তরবঙ্গকে ইজরায়েল বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন প্রফুল্ল সেনরা। কিন্তু এক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়ালো রাজনীতি। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বিদায়ের পরে জ্যোতি বসুর আমলে সেচ দপ্তর এসে পড়লো আরএসপির হাতে। ১৯৭৭-এ সিপিএম রাজ্য চালানোর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ওই বছর লোকসভায় জনতা পার্টির জুনিয়র পার্টনার ছিল বামেরা। সেই জোট বিধানসভা ভোটে ভেঙে যেতেই বামেরা ক্ষমতায় আসে ভোট কাটাকাটির খেলায়। সেচ দপ্তর যে সোনার খনি সেটা বুঝতে দেরি হয়ে যায় সিপিএমের। বিভিন্ন ভাবে সেচ দপ্তরকে অপদস্ত করা শুরু হয়। প্রথমে টাকা কমিয়ে দেওয়া। পরে তিস্তার কাজ শুরু হতেই সিপিএম পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন একজন আপাদমস্তক সৎ ইঞ্জিনিয়ারকে মিথ্যা কেস দেয়। দপ্তরের কর্মীদের আন্দোলনে গ্রেপ্তারি বন্ধ হয় তখনকার মতো। এর মধ্যেই ওই জেলার সুপার হয়ে আসেন আইপিএস নজরুল ইসলাম। যিনি যেনতেন প্রকারে খবরে আসার জন্য সবসময়ই উদগ্রীব থাকতেন। পুরোনো ফাইল খুলে গ্রেপ্তার করেন শিবপুর থেকে পাশ করা সেই সৎ ইঞ্জিনিয়ারকে। জেলে ওষুধের অভাবে মৃত্যু হয় সেই মানুষটির। এই অবস্থায় তিস্তা প্রকল্প আবার বন্ধ করে দেয় দপ্তরের কর্মীরা।

এরপরে ২০০৯-এ লোকসভায় হেরে বামফ্রন্ট আবার তিস্তা প্রকল্প শুরু করে। কিন্তু ২০১১-তে তারা ক্ষমতা হারায়। নতুন ক্ষমতায় আসা তৃণমূল সরকার জমি অধিগ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় এবারও আটকে যায় তিস্তা। কেন্দ্রের দেওয়া ১৭০০ কোটি টাকার সিংহভাগ ফিরে যায়। যে উত্তরবঙ্গ প্রতি বছর বন্যায় ভেসে যায়, সেই বন্যার জলকে ধরে রেখে দেশের খাদ্যভাণ্ডার হতে পারতো উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গ প্রচুর আনারস ও টমেটো হয়। কিন্তু সেটাও হিমঘরের অভাবে নষ্ট হয়। রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ হওয়ার জন্য খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ কিংবা রপ্তানিতে বিনিয়োগের জন্য কোনো প্রস্তাব আসে না।

কিন্তু শিল্প হয় না কেন? হলদিয়া থেকে শিলিগুড়ির দূরত্ব মাত্র ৬৭৭ কিলোমিটার। কিন্তু সড়ক বরাবর যেতে সময় লাগে একদিন। ভালো রাস্তার অভাব। রাস্তায় রেল ক্রসিং। সেই ক্রসিঙে কেন্দ্র সরকার ওভারব্রিজ বানাতে গেলে বাধা দেয় স্থানীয় ব্যবসায়ী। সঙ্গে শাসক দল তৃণমূলের পঞ্চায়েত নেতারা। পালিয়ে যায় ঠিকাদার। এ এক অদ্ভুত রাজ্য! ২০১১-তে NHAI ডালখোলা থেকে বরহমপুর রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করে একটি বেসরকারি সংস্থা, পিপিসি মডেলে। কিন্তু ডালখোলার ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে ও জমির অভাবে সেই ঠিকাদার পালিয়ে যায় এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের মামলা করে। এছাড়া এই দক্ষিণে, মোরগ্রাম থেকে হলদিয়া একটা আধুনিক সড়কের জন্য এশিয়া ডেভেলপমেন্ট বোর্ড ওই বছরই রাজ্যকে ৩০০০ কোটি টাকা দেয়। সেই টাকাও সম্পূর্ণ ফেরত চলে যায় ওই জমিজটের কারণে। এখন, যদি বন্দরে যাওয়ার রাস্তা না থাকে কেন কোনো বিনিয়োগকারী উত্তরবঙ্গে বিনিয়োগ করবে? জমির অভাবে বাগডোগরা বিমানবন্দর সম্প্রসারণও পিছিয়ে গেছে দশ বছর।

এবার আসি পর্যটনে। চা-পর্যটনের নামে আবার যথেচ্ছভাবে জমি দেওয়া শুরু হয় কিছু অসৎ ব্যবসায়ীকে, যারা কোনো শ্রমিক আইনের তোয়াক্কা করে না। ফলে স্থানীয় মানুষের হাতে টাকা আসে না। সঙ্গে স্থায়ীভাবে ধ্বংস হয় পরিবেশ। যেমনটি হয়েছে সিঙ্গুরে। না করা যায় চাষ, না আছে শিল্প। বাইরের ব্যবসায়ীরা টাকা উপার্জন করে চলে যায়, স্থানীয়রা সেই তিমিরেই।

আরও একটা কারণে স্থানীয় অর্থব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। আশির দশক পর্যন্ত সরকারি আধিকারিক, অধ্যাপক, ডাক্তাররা পরিবার নিয়ে থাকতেন উত্তরবঙ্গে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অবনতি হতে, এঁরা অধিকাংশ পরিবার কলকাতায় রেখে, এখানে তিনদিন অফিস করা শুরু করেন। ফলে বাজারের পয়সা কম আসা শুরু হলো, ফলে পড়তে থাকলো বাজার। এমনকী স্থাবর সম্পত্তির দামও বাড়লো না। চাষের জমি বহিরাগতদের বিক্রি করে কলকাতা বা অন্য রাজ্যে চলে যায় স্থানীয়রা। দ্রুত বদলাতে থাকে জনবিন্যাস।

আটের দশকে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, রায়গঞ্জ বা বালুরঘাটের স্কলাররা, যারা রাজ্য ছেড়ে ভিনরাজ্য বা বিদেশে চলে গেছেন, তাঁরা অবসরের পরে ফিরে কলকাতা বা নিউটাউনে শেষ জীবন কাটাতে ফ্ল্যাট কিনছেন। কারণ উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যব্যবস্থার প্রতি তাঁদের ভরসা নেই। সঠিক স্বাস্থ্য পরিকাঠামো থাকলে তারা তাদের সারা জীবনের উপার্জন যদি নিজের জেলায় বিনিয়োগ করতেন, সেখানে বহু মানুষ কাজ পেত। কিন্তু কলকাতার বিমাতৃসুলভ আচরণের বলি হচ্ছে সেখানকার ভূমিপুত্ররা।

উত্তরবঙ্গকে বদলাবার উপায় :

১. চা-শিল্পে শৃঙ্খলা আনা এবং সত্যিকারের চা-ব্যবসায়ীকে দায়িত্ব দেওয়া। যেমন টাটা। কিংবা আন্তর্জাতিক রপ্তানিভিত্তিক বড়ো বহুজাতিক সংস্থা।

২. তিস্তা প্রকল্প শেষ করা। দরকারে SSNNL বা KNNL-এর মতো কোম্পানি বানিয়ে।

৩. জলপাইগুড়ি ও বালুরঘাটে গবেষণা ও পরিষেবা শিল্পকেন্দ্র বানানো।

৪. আন্তর্জাতিক মানের সড়ক ও ডেডিকেটেড মালগাড়ি পরিষেবামূলক রেল প্রকল্প।

৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রকে শক্তিশালী করা।

৬. প্রশাসনকে রাজনীতিমুক্ত করে বিনিয়োগের রাস্তা খোলা।

গত পাঁচ দশকের অবহেলার পরে কলকাতাকে উত্তরবঙ্গবাসী আজ বিমাতা ভাবতে শুরু করেছে। বর্তমান সরকারের প্রচুর সীমাবদ্ধতা— জমিনীতি, সেচনীতি থেকে দুর্নীতি। তার থেকে বড়ো সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক সদিচ্ছার। উত্তরবঙ্গ যে ডোল চায় না, সেটাই বুঝতে চাইছে না নবান্ন।

উত্তরবঙ্গের মানুষ চায় কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য। ফিরে পেতে চায় তাদের প্রবাসী আপনজনদের। সমাজ যে ভেঙে পড়ছে। কলকাতার মানুষ বলতে পারে উত্তরবঙ্গ আমার ভাই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের কাছে কলকাতার ব্যবহার যে বিমাতৃসুলভ। রপ্তানি কেন্দ্র উত্তরবঙ্গ আজ উন্নয়নহীন স্থলবেষ্টিত এক ভূখণ্ড। তাই তাদের মধ্যে আওয়াজ উঠছে স্বায়ত্তশাসনের। যদি তারা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অংশ হয়েও বন্দরের থেকে অনেক দূরে চলে যায় পরিকাঠামোর অভাবে, তবে তারা উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলির মতো কর ছাড়-সহ অন্যান্য সুবিধা পাবেন না কেন? এর জন্যই সম্ভবত তাঁদের কেউ কেউ আলাদা রাজ্যের দাবিও করছেন। অন্তত নিজের ভাগ্য তো নিজে নির্ধারণ করতে পারবেন তাঁরা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যদি উত্তরবঙ্গের জন্য সঠিক উন্নয়নের পরিকল্পনা না করে, ক্ষোভ কিন্তু বাড়বেই। উত্তরবঙ্গ চায় উন্নয়ন, ভিক্ষা তারা চায় না। □

সংখ্যালঘু-বান্ধব আওয়ামি লিগ সরকারের আমলে বাংলাদেশে হিন্দু কমে যাওয়া সম্প্রীতির চমৎকার দৃষ্টান্ত

শিতাংশু গুহ

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু বিশেষত হিন্দুর সংখ্যা কমেই চলেছে। ২০১১ সালের আদমশুমারিতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৮.৫৪ শতাংশ, ২০২২-এ সেটি কমে এখন ৭.৯৫ শতাংশ। দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৬১৬। তারমধ্যে মুসলমান জনসংখ্যা ৯০.৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯১.০৪ শতাংশে পৌঁছেছে। জনসংখ্যা ও আবাসন শুমারি-২০১১-এর প্রাথমিক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে। বর্তমান আদমশুমারি অনুসারে দেশে এখন হিন্দুর সংখ্যা ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার ১১০ জন (৭.৯৫ শতাংশ)। বৌদ্ধ জনসংখ্যা ০.৬২ শতাংশ থেকে কমে ০.৬১, খ্রিস্টান জনসংখ্যা ০.৩১ শতাংশ থেকে কমে ০.৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য ০.১৪ থেকে ০. ১২-তে নেমে এসেছে।

বিগত বছরগুলিতে বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে বলে দেশে-বিদেশে যথেষ্ট হইচই হচ্ছিল। পরিস্থিতি সামাল দিতে সরকার ২০১৫ সালে একটি প্রতীকী শুমারি করে জানায় যে, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনসংখ্যা বেড়ে ১১.৮ শতাংশ হয়েছে, এর মধ্যে হিন্দু ১০.৫ শতাংশ। সরকার বিরোধীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, হিন্দু জনসংখ্যা কমছে না, বরং বাড়ছে। এখন বোঝা যাচ্ছে, ২০১৫-র ওই গণনা ছিল একটি সরকারি ধাপ্পা। দেশে এখন অমুসলমান জনসংখ্যা ১০০-৯১.৪ = ৮.৬ শতাংশ। ২০১৫ থেকে ২০২২ এই সাত বছরে হিন্দুর সংখ্যা কমেছে১১.৮-৮.৬ = ৩.২ শতাংশ। এই হারে হিন্দু বা সংখ্যালঘু কমতে থাকলে 'মদিনা সনদ'-এর পুরোপুরি বাস্তবায়ন অর্থাৎ দেশটি ১০০ শতাংশ মুসলমানে পৌঁছতে বা হিন্দুশূন্য হতে কতটা সময় লাগবে, সেই হিসাবটা খুব কঠিন নয়।

২০১১ থেকে ২০২২, এ সময়টায় ক্ষমতায় রয়েছে সংখ্যালঘু ও হিন্দুবান্ধব আওয়ামি লিগ সরকার। হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্য বিএনপি-জামাতকে দায়ী করার কোনো কারণ নেই। এর দায় সম্পূর্ণ বর্তমান সরকার আওয়ামি লিগের। সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে এর একটা যুতসই উত্তর খুঁজে বের করে ফেলবে বটে! এই যে আদমশুমারি নিয়ে কথা হচ্ছে, এটি প্রাথমিক প্রতিবেদন। চূড়ান্ত রিপোর্টে হয়তো সঠিক অঙ্ক কষে হিন্দুদের সংখ্যা আরও বাড়িয়েও দেখানো হতে পারে। বাংলাদেশে সবই সম্ভব। দিনের ভোট রাতে হলে কমপিউটার বিভ্রাটে হিসাবে ভুল হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। মনে হয় বিবিএস (বাংলোদেশ ব্যুরো স্ট্যাটিসটিক) বিএনপি'র সঙ্গে মিলে সরকারকে বিপদে ফেলতে এই ষড়যন্ত্র করছে। কিন্তু আওয়ামি সরকারের আমলে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়া সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার দৃষ্টান্ত।

হিন্দু বা সংখ্যালঘুদের সংখ্যা কমে যাওয়ার অনেক কারণ আছে। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিরাপত্তাহীনতা। সরকার হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে যে ব্যর্থ তা কিন্তু নয়, দিতে পারছে না। বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে সন্ত্রাসীকে নয়, ভিকটিমকে আগে গ্রেপ্তার করা হয়। এর অসংখ্য উদাহরণ আছে। নাসিরনগর, শাল্লা বা লোহাগড়ায় পুলিশ খুব তাড়াতাড়ি আকাশ সাহা ও তাঁর বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে, কারণ এঁরা হিন্দু। সর্বত্র একই দৃশ্য। পুলিশ হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয় না। সন্ত্রাসীদের পক্ষ নেয়। এক হিন্দু শিক্ষক পরিষ্কার বলেছেন, 'দুশো পুলিশের সামনে তৌহিদী জনতা তাঁর গলায় জুতোর মালা পরিয়েছে।' হিন্দুদের প্রতি সর্বত্র বৈষম্য, ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়। কোনোরকম সুবিচার না পাওয়ায় হিন্দুরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন সংযোজন-- ইসলাম অবমাননার ভুয়ো অজুহাত, এতেও হিন্দুরা দেশত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে।

পরিষ্কার ভাবেই বলা যায়, হিন্দু বা সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার ও নিপীড়ন বন্ধে প্রশাসন ও সরকারের ভূমিকা লজ্জাজনক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শুধু মুখে। আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা এখন দিনেরবেলা বঙ্গবন্ধুর সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্লোগান দিয়ে রাতে সাঈদীর ওয়াজ শুনে ঘুমাতে যায়। ২০০১-এর পর বিএনপি'র আমলে হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে, গত এক যুগে আওয়ামি লিগের শাসনকালে সেই রেকর্ড ম্লান হয়ে গেছে। দেশে এখন একটি জেহাদি গোষ্ঠী সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এদের উদ্দেশ্য হলো ভয়ভীতি সৃষ্টি করে হিন্দুদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। এই বিশেষ জেহাদি গোষ্ঠী তৈরির দায় সম্পূর্ণভাবে আওয়ামি লিগের। আওয়ামি লিগ সরকার জঙ্গিবাদ দমন করেছে, সর্বহারা বা নকশালদের নিশ্চিহ্ন করেছে। মনে করলে সরকার সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধ করতে পারত, কিন্তু তা করেনি। জীববিজ্ঞান বলে, জীব (শুধু মানুষ নয়) নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে স্থানত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে চলে যায়। বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা কমে যাওয়া এটাই কারণ, অন্যসব গৌণ।

(লেখক প্রবাসী বাংলাদেশি)

পুজো এলেই বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য ভয় হয়

হিন্দুরা সম্প্রীতির সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত, ধর্মের আগে মানবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। হিন্দুরা নিজের ধর্মকে সর্বেসর্বা বলে দাবি করে না, সর্বধর্ম সমজ্ঞানে সমান মেনে, নিজ ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

রাহুল দাস

ঠাকুমার মুখে শোনা। তখন ভারত-পাকিস্তান পার্টিশন হয়ে গেছে। ঠাকুমা পার্টিশন বোঝে না, বলে রাইট। ঠাকুমার ভাষায় যখন রাইট চলছিল, তাঁর বয়স হবে বছর ছয়-সাতেক। প্রথম প্রথম আমিও রাইট শব্দের অর্থ বুঝে উঠতে পারিনি, অনেক ছোট ছিলাম তো! তবে তাঁর মুখের গল্পগুলো শুনতে শুনতে একটা সময় মনের ভিতরে একটা কল্পনায় ঘেরা ছবি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম রাইট মানে যুদ্ধ-টুদ্ধ হবে হয়তো। কাহিনিগুলো যে সব একইরকমের....

মাঝে মাঝেই হুঁশিয়ারি শোনা যেত... 'সকল হিন্দুদের জানানো যাইতেছে যে, দুইদিনের মধ্যে যদি তারা পাকিস্তান ছেড়ে না যায়, তাহলে যেন আত্মহত্যা করে নেয়, নাহলে কচুকাটা হবার জন্য যেন তৈরি থাকে।' পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল হাজার হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ি। গোয়াল ভরা গরু, বাছুর, শিশু, নারী, নবীন, প্রবীণ কেউ রক্ষা পায়নি। জ্যান্ত থাকতেই অনেকের চিতার স্বাদ আস্বাদন করা হয়ে গিয়েছিল। আধপোড়া দেহ নিয়েই অনেককে ছুটতে হয়েছিল নদীর ঘাটে, পাড়ি জমাতে অসম বা পশ্চিমবঙ্গের কোনো অচেনা নদীর তটে, জীবন রক্ষার তাগিদে!

বাজার ঘাটের রাস্তা ধরে ছুরি, বাঁশের লাঠি, হাত দা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো একদল লোক, ওরা সেই গাঁয়ের নয়। ভাড়া করে আনা লোক। ওদের কাজ ছিল হিন্দুদের বিতাড়িত করা। সোজা কথায় দেশ না ছাড়লে পিটিয়ে মারা। নয়তো অসহ্যভাবে শোষণ, নিপীড়ন, অত্যাচার চালিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা। সুযোগ পেলেই চলতো ধর্ষণ, সম্পদের লুণ্ঠন। বলতে বলতেই ঠাকুমার গলার স্বর কেঁপে উঠতো।

—তাইলে তুমারা তহন কী করতা?

—আমরা আর কী করুম! আমগো বাপ, কাকা, জ্যাঠারা হায় হুতাশ করতো! এই মাদবরের পায়ে পড়তো, ওই মাদবরের পায়ে পড়তো। কিন্তু কামের কাম কিছুই অইতো না।

—অরা কি ভালো মানুষ আছিল?

—পত্তম পত্তম কইতো, চিন্তা কইরেন না, আমরা তো আছি নাকি! আপনেগো কুনোহানেই যাওন নাগব না।

—তাইলে দ্যাশ ছাড়ল ক্যান?

—পত্তম পত্তম সাহস দিলেও পরে অরাই পলাইয়া আওনের বুদ্ধি দিল। কইতো, আমরা

তো চাইছিলাম সবাইরে একলগে নিয়েই থাকুম। কিন্তু ওই শালা ড্যাহরেরা ছাড়বো বইলা মনে অয় না! ইয়ার থিকা ভালা আপনেরা সুযোগ বুইঝা পলাইয়া যান।

—তাহলে ক্যামনে আইলা এই দ্যাশে?

—রাইতের অন্ধকারে গোয়ালি ভরা গোরু বাছুর বাইন্দা, পিতল-কাঁসার বাসনপত্তর গুইলা পুঁটলি কইরা বাইন্দা কুয়ার মধ্যে ফালাইয়া দিলো আমার বাপে, ধুঁতির কুচিত কয়েকটা আদুলি, সিকি পয়সা নিয়া মাদবরের বাড়ির পিছন দিয়া ঘাটে আইলাম। মাদবর আমগরে সঙ্গেই আছিল। মাদবর কইছিল, পরিস্থিতি যদি সিঁথিল অয়্যা যায় ওই জিনিসগুইন বিক্রিবাট্টা কইরা ট্যাহা-পয়সা যা পাবো নিয়ে আহার জন্যে।

—তাহলে আর যাও নাই দ্যাশে?

—আমি তো যাই নাই আর, বাপে একবার গেছিল। মাদবরের সঙ্গে দেহাও করছিল, কিন্তু মাদবর বাপের কোনো কথাই হুনে নাই। জমিজমা সয়-সম্পত্তি সব দহল কইরা নিছিল।

এরপরে একে একে মাঝির টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেওয়ার কথা, নদীর ঘাটে একই গাঁয়ের লোকেদের রক্তের স্রোতকে তোয়াক্কা না করে নৌকা দখলের প্রচেষ্টা, নিজেদের জীবন ভিক্ষা দেওয়ার করুণ আর্তনাদ, সবই ভেসে উঠতো ঠাকুমার চোখে মুখে। পরনে থাকা একটি জামা, শাড়ি, ধুতি, পাজামা ছাড়া আর কিছুই সে দেশ থেকে আনা হয়ে ওঠেনি। সঙ্গে এসেছিল অজস্র স্মৃতি, আর্তনাদ আর ওদের প্রতি একরাশ ঘৃণা আর অবজ্ঞা।

এদেশে এসে জায়গা হলো ক্যাম্পে। তারপর মিলল থাকার জন্য জায়গা। দুই হাল করে গোরু আর চারবিঘে করে জমি। এদেশেও অনেক বাড়িঘর পুড়েছিল, অনেকের সম্পত্তি কুয়োর মধ্যে লুকোনো ছিল, ঘরের পৈঠার নীচে খুঁড়ে পাওয়া যেত রুপোর কয়েনের কলসী। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করলো। পাকিস্তান আবার দু'টুকরো হলো, মধ্যস্থতায় ছিল এই ভারত। একটা দেশ টুকরো টুকরো হলো, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ বিসর্জন হলো। ওরা নিজেদের দেশ খুঁজে পেল, কিন্তু সেদেশে পড়ে থাকা হিন্দুরা? ওরা আজ পর্যন্তও নিজের দেশ খুঁজে পেলো না!

সেইসব অতীত। সময় পালটেছে। যাদের সুরক্ষার দোহাই দিয়ে দেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হলো, তাদের সংখ্যা অতীতের তুলনায় অনেক বেড়েছে এইদেশে। ওরা দেশকে ভালবেসে এখানেই থেকে গিয়েছিল, ছেড়ে যাবার প্রয়োজন পড়েনি অনেকেরই। যারা ভাগ হয়ে গেলো, ওরা দেশের সংবিধানেও ধর্মের খুঁটি পুঁতে দিল। তবুও এদেশের সচ্চা মুসলমানরা দেশ ছাড়লো না! ওরা জানতো, এদেশে থাকা ততটাই নিরাপদ, যতটা আস্থা একটা বাস ড্রাইভারের উপরে রাখা যায়। একটা বাসে উঠলে আমরা নিশ্চিন্তে থাকি, যে একটা সময় অনায়াসে গন্তব্যে পৌঁছে যাবো, বাসে থাকা সমস্ত যাত্রীদের জীবন সেই একটা বাস ড্রাইভারের উপরেই নির্ভরশীল থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা গন্তব্যে পৌঁছায়। এই ভারতটাও সবার জন্য সেই বাস ড্রাইভারের মতো নির্ভরযোগ্য। এখানে সবাই নিরাপদ। এদেশে বাক্ স্বাধীনতা আছে, ধর্মীয় স্বাধিকার আছে, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও আছে, তবুও অনেকে মড়াকান্না জুড়ে দেয়—এদেশের মুসলমানেরা ভালো নেই। ওরা স্বার্থলোভী, নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে অজস্র মুসলমানকে নিজেদের হাতের পুতুলে পরিণত করেছে, ওদের মানসিক অগ্রগতিকে স্তিমিত করেছে, আজও করছে, হয়তো ভবিষ্যতেও করবে।

পাকিস্তান বদলায়নি। বদলায়নি নতুনভাবে গড়ে ওঠা বাংলাদেশও। এই দেশদুটোতে মানুষ বাড়ছে। হিন্দু কমছে, মানুষ বাড়ছে কিন্তু মান ও হুঁশ বিহীন মানুষের সংখ্যাটাই বেশি। হিন্দু নিধন চলছে। দুর্গাপূজায় ষড়যন্ত্র করে হিন্দুদের মুণ্ডচ্ছেদ করা হচ্ছে, যতন সাহারা মরছে, বিনা কারণে, বিনা দোষে। আর আমরা, আমরা অনেকেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে চলেছি। ধর্মের খাতিরে না হোক, মানবতার খাতিরেও মুখ খুলছি না! সঠিক বিষয়টা চোখে চোখ রেখে, সৎ সাহস নিয়ে তুলে ধরতেও আলস্য বোধ করছি! মুখ বুজে মেনে নিচ্ছি দিবারাত্র ঘটে যাওয়া অন্যায় আবদার-আন্দোলনগুলোকে, আন্দোলনের নামে ধর্মীয় গোঁড়ামির মূর্খতাগুলোকে। এই দেশ সেকুলার ছিলো না! সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সেকুলার করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেকুলার শব্দটা যুক্ত না হলেও হয়তো এই দেশ ধর্মান্ধ কখনোই ছিলো না! এদেশে কেউ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগত না! দুঃখের বিষয়, দেশ সেকুলার হলো কিন্তু দেশের ভাবনাচিন্তা সেকুলার হতে পারলো না। ধর্ম নিয়ে যুক্তিতর্ক সভা হচ্ছে, অথচ সঠিক একটা তথ্য তুলে ধরার জন্য দেশ পুড়ছে, আন্দোলন হচ্ছে, দেশের সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে, দিনের আলোতে ড্যাগারের কোপে সাধারণ মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ হচ্ছে....আমরা নীরব দর্শক!

হিন্দুদের দুর্বলতা হচ্ছে, এরা সন্ত্রাসবাদী হতে পারে না, নিজ ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত হানলে মুণ্ডচ্ছেদের হুংকার দিতে জানে না, সেকুলার সেজে সম্প্রীতির সুগন্ধ ছড়িয়ে দিতে অভ্যস্ত, ধর্মের আগে মানবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। হিন্দুরা নিজের ধর্মকে সর্বেসর্বা বলে দাবি করে না, সর্বধর্ম সমজ্ঞানে সমান মেনে, নিজ ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

এখন আর ঠাকুমার মুখে সেইসব গল্প শুনি না। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে করতেই সেই রাইট শব্দের অর্থ খুঁজে পেয়েছি। 'রাইট' মানে যুদ্ধ নয়, অধিকার। সেই অধিকার, যে অধিকারে অন্যদের হস্তক্ষেপ থাকে, সেই অধিকার যাকে উপভোগ করতে গেলে হিন্দু নিধন করতেই হবে, যাকে আদায় করতে গেলে হিংসার পথ অবলম্বন করতে হবে! আজও তারা সেই রাইটস চালিয়ে যাচ্ছে, তাইতো একসময় ত্রিশ শতাংশে থাকা হিন্দুরা আজকের দিনে দশ শতাংশেরও নীচে এসে দাঁড়িয়েছে। ওরা ওদের রাইটস চালিয়ে যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষভাবে। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবীরা সে খবর রাখে না, রাখার প্রয়োজন মনে করে না। এক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস বলে কিছু হয় না! খুব কষ্ট হয়, যারা সেদেশ ছেড়ে আসতে পারেনি, এদেশে পালিয়ে আসা লোকেরা ফেলে এসেছিল, তাদের জন্য। গা শিউরে ওঠে, একুশের দুর্গাপূজার কথা ভাবলেই, আবারও যে দুর্গাপূজা আসছে! □

নগরীর নাম উজ্জয়িনী

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনী বিখ্যাত নগরী ও তীর্থস্থান। এটি শিপ্রা নদীতটে অবস্থিত। মহাকবি কালিদাস স্মৃতিবিজড়িত উজ্জয়িনীর প্রাচীন নাম অবন্তী। পুরাণ অনুসারে ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাকাল শিব জয়লাভ করেন। এই ঘটনাকে স্মরণীয় রাখার জন্য অবন্তীর নাম হয় উজ্জয়িনী। উৎ-জয়নী- উজ্জয়িনী। যাইহোক এবার ইতিহাসের পথে হাঁটা যাক। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ছিল ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৪১৫ খ্রিস্টাব্দ। তিনি গুপ্ত বংশের শক্তিশালী ও শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। তাঁর ৪০ বছরের রাজত্বকালকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ বলা হয়। কালিদাস রচিত রঘুবংশ গ্রন্থ অনুযায়ী তিনি ২১টি রাজ্য জয় করেন এবং তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি ছিল শকদের পরাজিত করা বা জয়ী হওয়া। এরপর তিনি শকারি উপাধি গ্রহণ করেন। শকদের বিনিষ্টকারী হচ্ছেন শকারি। আবার ইতিহাস ও আধুনিক খননকাজ থেকে জানা যায় সম্রাট অর্থাৎ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই অবন্তী নগরীতে দ্বিতীয় নতুন রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন জয়ের সাফল্য স্মরণীয় রাখার জন্য অবন্তীর নাম পরিবর্তন করে জয়সূচক নাম 'উজ্জয়িনী' করেন।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

বঙ্গের আকাশে অশনি সংকেত

ভাবতে অবাক লাগে। নেতাদের এতো টাকা! ঠিক যেন টাকার পাহাড়! রাজকোষ শূন্য কিন্তু নেতাদের বাড়িতে বস্তা বস্তা টাকা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। একজন লোকের বেঁচে থাকতে এতো টাকা লাগে? গণতন্ত্রের পিঠে চড়ে জনগণকে নিঃস্ব করে এ কী মজার খেলা। নেতাদের কেলোর কীর্তি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গায়ের চামড়া এতো মোটা লজ্জাবোধ আছে বলে মনে হয় না। এখন শাসক দল আর দুর্নীতি এক হয়ে গেছে। গণতন্ত্রের সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের এমন দানবিক রূপ দেখে গায়ে কাঁটা দেয়। আগে দুর্নীতির অভিযোগ এলে মন্ত্রীরা পদত্যাগ করতেন। হাওলা কেলেঙ্কারিতে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী, কংগ্রেসের অজিত পাঁজা পদত্যাগ করেছিলেন। আর এখন দেহত্যাগের আগে পর্যন্ত কোনও ভাবে পদত্যাগ নয়।

কোভিডের সময় দেখেছি খিদের জ্বালায় শ্রমিকের কান্না। দেখছি বেকারত্বের হাহাকার। সব মিলিয়ে আজ বঙ্গের আকাশে অশনি সংকেত। এখন হাসব না কাঁদব, বাঁচব না মরব জানি না। নেতাদের হাতে আমরা এখন মরতে চলেছি।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

তৃণমূলের তোলাবাজির কাহিনি

প্রবীর মণ্ডলের বিস্ফোরক উক্তি। প্রবীর মণ্ডল একজন ব্যবসায়ী। টেন্ডারের মাধ্যমে জেলা পরিষদ থেকে কাজ পান তিনি। রিপাবলিক বাংলা নিউজ চ্যানেলকে অন ক্যামেরায় তিনি বলেন, কাজ পাওয়ার পর অনুব্রত মণ্ডল তার কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা চান। খেপে খেপে কয়েক কোটি টাকা প্রবীর মণ্ডল অনুব্রতকে দিয়েও দেন। বাকি টাকা দিতে না পারায় অনুব্রত প্রবীরের ৪৬ লাখ টাকার গাড়ি ছিনিয়ে নেয়। খবরে প্রকাশ, অনুব্রত মণ্ডলের কলকাঠিতে পড়ে নাকি টেন্ডারের কাজটাও হারাতে হয় তাঁকে। প্রতিশ্রুতি মতো সরকারি টেন্ডারের কাজ না পাওয়ায় ওই ব্যবসায়ী পরে যখন তাঁর গাড়িটি ফেরত চান, হুমকি দিয়ে অনুব্রত বলেন, 'গাড়ি ফেরত নিবি না গাঁজা কেস নিবি?'

তৃণমূলের পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়রা চাকরি বিক্রি করে টাকার পাহাড় বানিয়েছিল। সোনা মজুত, ডলার মজুত এবং কোটি কোটি টাকার জমি, বাড়িঘর বানিয়েছিল। আজ ওরা জেলবন্দি। তৃণমূল যেন কিছু জানে না এমনই ভাব দেখাচ্ছে। আর অনুব্রত তো টেন্ডার বিক্রি করতো। সঙ্গে গোরু পাচার, কয়লা, বালি পাচার তো আছেই। এই অনুব্রতর একটা মুদিখানা দোকান ছিল। আর মাঝে মাঝে মাগুর মাছের ব্যবসা করতো। আজ বেনামে তার হাজার হাজার কোটি টাকা। সিবিআই আজ বীরভূমের কোণায় কোণায় ছড়িয়ে পড়েছে। তৃণমূল যতই সিবিআইয়ের ওপর রাগ দেখাক তাতে কিছুই বদলাবে না। আজ হোক বা কাল অনুব্রত, পার্থ ও অর্পিতাকে স্বীকার করতেই হবে এই বিপুল পরিমাণ টাকা ও সম্পত্তির আসল মালিক কে। দেশের সাধারণ মানুষও আজ সেটাই জানতে চায়।

এরাই কায়দা করে সবাইকে চোর বানিয়ে নিজেদের অপরাধ হালকা করার চেষ্টা করছে। এ খবর কেন্দ্রীয় সরকারর কানে আছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যে রাজ্যে অফিসার পাঠিয়ে কোথাও ভারত সরকারের টাকা নয়ছয় হচ্ছে কি না খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাউকে ছাড়া হবে না। ওরা অভিযোগ করছে বিরোধীদের ভয় দেখানো হচ্ছে বলে। ওরা অন্যায় করার সময় কেন খেয়াল রাখেনি। মানুষকে ঠকিয়ে যে অর্থ ওরা ওরা মজুদ করেছে তার হিসাব তো ওদেরই দিতে হবে। নরেন্দ্র মোদী যতদিন থাকবে ততদিন এই পাপীদের শান্তিতে থাকতে দেবেন না। বিরোধীদলের কাছে যদি বিজেপির বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকে তারা তো কোর্টে যেতেই পারেন। শুধু মিডিয়াতে বড়ো বড়ো ভাষণ দিলে চলবে না। গরিব মানুষের হাতে কেবল ৫০০ টাকা দিয়ে নিজেরা তাদেরই পথে বসানোর কাজ করছে। ওদের সন্তানদের চাকরি লাখ লাখ টাকা নিয়ে অন্যকে বিক্রি করে দিচ্ছে। ৫০০ টাকা হাতে দিয়ে তার সন্তানকেই বঞ্চিত করছে।

এখনও কোনও বড়ো শিল্প রাজ্যে এল না। শুধু মউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। হাততালি আর ফ্লাশলাইট। তারপর? শুধুই অন্ধকার।

ফঃ ৩

নির্বাচনের সময় ছাপ্পা ভোট। পাড়ায় পাড়ায় তো সেই জন্যই অনুব্রতদের পোষা গুন্ডা। বুঝে দেখুন অনুব্রত তৃণমূলের জেলা সভাপতি। তার জন্য সরকার তাকে রক্ষী দিল। কেন্দ্রীয় সরকার নয়। তার নাম সায়গল। যার মাসিক বেতন কিনা ২০ হাজার টাকার কম। ভাবতে পারেন ওই সায়গল হুসেনের কাছে ১০০ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তি। ও অবশ্য বর্তমানে জেলে বন্দি। ওকেও বলতে হবে তার এই বিপুল সম্পত্তি কীভাবে হলো। এবার আর কারও বাঁচার পথ নেই।

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' আজও চলছে

গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং আজও চলছে। চলছে বাংলাদেশে, চলছে পাকিস্তানে, চলছে আফগানিস্তানে, কাশ্মীরে। বাদুড়িয়া, বসিরহাট, ক্যানিং, কালিয়াচক হয়ে এই স্বাধীন ভারতেরই আরও কত শত জায়গা আজও প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছে এই 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' প্রোৎসাহিত ফলিত রসায়নে। ফর্মুলা সেই একই। আদি অকৃত্রিম, মূর্তি পূজায় বিশ্বাসীদের ধরো আর কোতল করো। ধ্বংস করো কাফেরদের মন্দির। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তছনছ করে দাও তাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি। তবেই না সফল হবে জেহাদি সাম্রাজ্যবাদ। এই ভারতবর্ষ এক সময় দেখেছে বিন কাশিম, তৈমুর লং, বখতিয়ার খিলজি, চেঙ্গিস, মামুদ, ঔরঙ্গজেব, নাদিরদের। দেখেছে তাদের ভয়াবহ নৃশংস জেহাদি ধ্বংসলীলা।

একবিংশ শতকের ভারত আজও দেখছে তালিবান, আল কায়দা, হিজবুল মুজাহিদিন, হরকত-উল-আনসারি, সিমি, হেফাজত-ই-ইসলাম, জয়েস-এ- মহম্মদদের নামের পাশে 'আল', 'উল' বসিয়ে হাজার হাজার ইসলামিক সংগঠন। লক্ষ্য সেই একই 'প্যান ইসলামাইজেশন', দারুল-উল-ইসলাম। এই ধারাবাহিক জেহাদেরই এক মর্মস্পর্শী অধ্যায় গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। বাস্তবে হিন্দু-শিখ কোতল অভিযান। শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট মুসলিম লিগের নেতৃত্বে।

প্রথমে ময়দানে জমায়েত, তারপর শুধু নৃশংস জেহাদি হত্যালীলা। যদিও সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়েছিল অনেক আগেই মুসলিম লিগ স্থাপনের মাধ্যমে। সৈয়দ আহমেদের স্বপ্ন লালিত, মহম্মদ জিন্না জারিত মুসলিম লিগের একটাই লক্ষ্য ছিল ভারতকে টুকরো করে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তান। ন্যক্কারজনক ভূমিকায় ছিল কমিউনিস্ট দল। তাদের বক্তব্য ছিল 'আগে পাকিস্তান দাবি মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'। অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী তখন মুসলিম লিগের সোহরাবর্দি। দেশ স্বাধীন হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের হিস্যা বুঝে নেওয়ার জন্য পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে তৈরি হলো জেহাদি বাহিনী। মসজিদ মসজিদে প্রচার চলল। সক্রিয় হলো মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড। অবিভক্ত বাঙ্গলার গুরুত্বপূর্ণ পুলিশকেন্দ্রগুলি থেকে হিন্দু অফিসারদের সরিয়ে দেওয়া হলো। জেহাদিদের সরকারি আনুকূল্যে ট্রাক, চট, কেরোসিন, ছোরা, তলোয়ার, হাতবোমার অঢেল জোগান দেওয়া হলো। নেহরুর পরম মিত্র জিন্না বিবৃতি দিলেন, "আমাদের হাতে পিস্তল রয়েছে, পিস্তল দিয়েই আমরা পাকিস্তান বুঝে নেব।"

১৬ ডিসেম্বর ১৯৪৬, শুরু হলো ডাইরেক্ট অ্যাকশন। একের পর এক হিন্দু দোকান লুঠ হতে থাকলো। লুঠ হলো সম্ভ্রান্ত কমলালয় স্টোর্স, সি সি সাহার গ্রামোফোন, কে সি সাহার বন্দুকের দোকান। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে বের করে এনে প্রকাশ্য রাস্তায় খুন করা হলো। শিশুদের পা ধরে শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে, নারীদের ধর্ষণ করে হত্যার পর গোমাংস টাঙানোর আঁকশি দিয়ে রাস্তায় ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। চারপাশে শুধু মৃত্যু, হাহাকার, আর্তনাদ আর পলায়ন। প্রাণ বাঁচানোর করুণ আবেদন নিয়ে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোলে একের পর এক ফোন এলেও পুলিশ ছিল নিশ্চুপ। কারণ কন্ট্রোলরুমে স্বয়ং বসেছিলেন সোহরাবর্দি এবং কলকাতার তৎকালীন মেয়র ওসমান খান। তারা দাঙ্গা পরিচালনা করেছিলেন। প্রথম দিনের তীব্রতা কম থাকলেও দ্বিতীয় দিনে হাজার হাজার হিন্দুর রক্তে স্নাত হলো রাজপথ। সর্বত্র মৃতদেহের স্তূপ। সৎকার করবার লোক নেই। চিল, শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে মৃতদেহ। অসহায়, অপ্রস্তুত বাঙ্গালি হিন্দু সমাজ যখন নিজেদের সঁপে দিয়েছে ভাগ্যের হাতে, তখন গর্জে উঠলেন গোপাল মুখার্জি ওরফে গোপাল পাঁঠা। ব্যায়ামশালার যুবকদের একত্রিত করে হিন্দু মহাসভার সহায়তায় শুরু হলো প্রতিরোধ। শিখ যুবকরাও এগিয়ে এল। গোপাল বাহিনীর পালটা আঘাতে জেহাদিরা পিছু হটতে থাকল। বিস্তীর্ণ এলাকায় পালটা মার খেয়ে যখন জেহাদিদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে, তখন টনক নড়ল সোহরাবর্দির। তার নির্দেশে পুলিশ, আর্মি রাস্তায় নামল। নেহরু, মহাত্মা গান্ধী, কমিউনিস্টরা এবার ছুটে এল। গান্ধীজীর সেক্রেটারি গোপালকে ধমক দিলেন। কিন্তু অকুতোভয় গোপাল জানালেন, হিন্দু রক্ষায় ব্যবহৃত অস্ত্র তো দূর, একটা পেরেকও তিনি জমা দেবেন না। দিলেও নেতাজীর পায়ে তা সমর্পণ করবেন।

তৎকালীন বিভিন্ন সংবাদপত্রের মতে মাত্র চার-পাঁচ দিনেই প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। যদিও বাস্তবে সংখ্যাটি ছিল আরও অনেক বেশি। জেহাদি আগ্রাসনের ধারাবাহিক কোতল অভিযান এর পরেও বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। পরবর্তী গন্তব্য নোয়াখালি। সেখানেও সেই একই করুণ, মর্মস্পর্শী কাহিনি। ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যা ও ধর্মান্তরকরণ। বিশেষ করে জেহাদিরা যেভাবে নারী লুণ্ঠন, ধর্ষণে মেতে উঠেছিল ইতিহাসে তার জুড়ি মেলা ভার। কলকাতায় কিছু প্রতিরোধ হলেও নোয়াখালিতে কিন্তু অসংগঠিত হিন্দুসমাজ অসহায় আত্মসমর্পণ করে। হিন্দুদের দুর্ভাগ্য সেখানে কোনও গোপাল পাঁঠা ছিল না।

—মন্দার গোস্বামী,
২৩, ঈশ্বরবাবুর গলি খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ।

দ্রৌপদী মুর্মুর জন্য গর্বিত জনজাতি সমাজ

মৌসুমী সরেন

বৈচিত্র্যপূর্ণ ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণের সুদৃঢ় জাতীয় একতার মাঝে ভারতীয় সংবিধানের কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী তথা পঞ্চদশতম রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হলেন জনজাতি সমাজের এক দৃঢ়চেতা, তেজস্বিনী নারী দ্রৌপদী মুর্মু। প্রগতিশীল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, ভারতবর্ষের সংবিধানের রক্ষাকর্ত্রী তিনি। দেশের সর্বোচ্চ গুরুদায়িত্ব পালনের ভার তাঁর ওপর ন্যস্ত। তিনি সার্বিকভাবে জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি, জাতীয় চেতনার অগ্রদূত।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ব্যক্তিগত জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনি সমগ্র ভারতবাসীর মনে বাধা প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে অনুপ্রেরণা হিসেবে নতুন আশা, কিরণের সঞ্চার করবে। বেগবতী নদীর মতোই যেন তিনি প্রবহমান।

শপথগ্রহণের প্রাক্কালে প্রারম্ভেই দৃঢ়কণ্ঠে সমগ্র ভারতবাসীকে নিজের মাতৃভাষায় 'জঁহার' অর্থাৎ বিনম্র নমস্কার জানিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিলেন দ্রৌপদী মুর্মু। উন্নয়নশীল ভারতবর্ষের জনজাতি সমাজ থেকে উঠে আসা একজন সুশিক্ষিকা, রাজনৈতিক নেত্রী, রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর কর্মোদ্দীপনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল সমগ্র জাতি; রচিত হলো এক নব ইতিহাস।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেমন, অন্ধ্রপ্রদেশে অন্ধ্র, ভীল, চেঞ্চু, গোণ্ড, অসমে চাকমা, দিমাসা, গারো, কেরলে আদিয়ান, অরন্দন, ইরাভল্লন, মধ্যপ্রদেশে আগরিয়া, বৈগা, ভাইনা, মহারাষ্ট্রে করদা, বামচা, মণিপুরে আইমোল, রাজস্থানে ভীল, দামোরু, পশ্চিমবঙ্গে মুণ্ডা সাঁওতাল, ওরাওঁ ইত্যাদি বহু বনবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন বসবাস করেন। এই জনজাতি সমাজের একজন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। স্বভাবতই ভারতবর্ষের বনবাসী জনমানসে আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নতুন আলোর সঞ্চার হয়েছে। তাই এই আলোর কাণ্ডারিকে সামনে রেখে জনজাতি সমাজ তাদের জন্য বহু উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাক্ষী হতে চাইছে। মূলত সান্তাড় জনজাতিদের নিয়েই এখানে আলোচনা করা হলো।

শিক্ষাই আনে জ্ঞানের আলো, আনে প্রগতি। সাঁওতালি ভাষা অষ্টম তপশিলে যুক্ত হওয়ার পর এই ভাষায় সান্তাড়ী মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যাতে সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে তার জন্য বহু বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। সান্তাড় শিক্ষার্থীরা সান্তাড়ী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করলে তাদের ভাষাগত সমস্যা দূরীকরণের এই গঠনমূলক কাজ শিক্ষায় গতি আনবে এবং সেইসঙ্গে শিক্ষিত জনজাতি সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ। সুবৃহৎ সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, মানব হিতৈষী লেখক, সাহিত্যিক, কবি যাঁরা জনজাতিদের সংস্কৃতি, সংগ্রাম, কাহিনি লেখেন, সেই সমস্ত তাদের রচনাগুলির যথাযথ সংরক্ষণ করা উচিত এবং সেইসঙ্গে উৎসাহ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পুরস্কারে সম্মানিত করা প্রয়োজন।

ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর এক বৃহৎ মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, অস্পৃশ্যতা বিলোপের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে জনজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে প্রকৃত তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি নন যাঁরা তাদের এক বৃহৎ অংশ ভুয়ো শংসাপত্র নিয়ে চাকরিতে যোগদান করে চলেছেন। এই গুরুতর স্পর্শকাতর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সেই সমস্ত ভুয়ো শংসাপত্রধারীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন খেলায় যেমন তীরন্দাজি, ফুটবলে জনজাতি পুরুষ, মহিলারা দক্ষতা প্রমাণ করে চলেছে। খেলার প্রতি তাদের এই অনাবিল ভালোবাসা, পরিশ্রম চরিতার্থ করার জন্য তাদের উন্নতির দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত।

অরণ্যের উপর জনজাতি সমাজের এক সুনিশ্চিত অধিকার রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক বন সুরক্ষা আইন ১৯৪০-এর সংস্কারমূলক ২৪ জুন ২০২২ যে নতুন বিধি আইন, বন অধিকার আইন ২০০৬ আর বন পরিবেশমন্ত্রক ২০০৭ সালের সংশোধন বনবাসীদের অরণ্যের অধিকারকে খর্ব করছে বলে অনেকে মনে করেন। বনবাসীদের অরণ্য থেকে উৎখাতের হৃদয়হীন, মর্মস্পর্শী, নির্মম অত্যাচারের যে প্রয়াস, জনজাতিদের সংস্কৃতি, জীবনজীবিকা ধ্বংসের জন্য যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে এর ন্যায়বিচারের জন্য উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সার্বিকভাবে ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য তাঁর ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রপতি হিসেবে এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করবে। সুবিধাবাদী কিছু মানুষ জনজাতিদের সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেবার অজুহাতে জোর করে তাদের ধর্মান্তরকরণের এক নিম্ন প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জনজাতিদের স্বকীয় বা নিজস্ব ধর্মকোডের স্বীকৃতির মাধ্যমে ধর্মান্তরকরণের এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়টি দূরীকরণ করার আবেদন রইল মহামহিম রাষ্ট্রপতির কাছে। ❑

গরম আবহাওয়ায় ডায়েরিয়ার প্রকোপ

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

এখন ভ্যাপসা গরম। এই রকম গরম আবহাওয়ায় ডায়েরিয়ার প্রকোপ বাড়ে। হাসপাতালগুলোতে ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে নানা বয়সিরা ভিড় করছেন। অসহ্য গরমে গলা যখন শুকিয়ে যায়, তখন চোখের সামনে যে ধরনের পানীয় থাকুক না কেন তা দিয়ে গলা ভেজাতেই মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পানীয় দূষিত না বিশুদ্ধ সেদিকে কারও আর নজর থাকে না। এভাবে খাদ্য ও জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। আর ডায়েরিয়াকে বলে সামার ডায়েরিয়া। জলবাহিত ডায়েরিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমাদের জলকে জীবাণুমুক্ত করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। খাদ্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে খাদ্যের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে গ্রীষ্মে যে কোনো উৎসব-অনুষ্ঠান বা বাইরের খাওয়াদাওয়া নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

ডায়েরিয়ার জীবাণু : সাধারণত পরিপাকতন্ত্রে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণেই ডায়েরিয়া হয়ে থাকে, আমাদের দেশে এই সময় ব্যাপক হারে ডায়েরিয়ার প্রধান কারণ রোটা ভাইরাস, কখনও কখনও নোরো ভাইরাস। তবে পাতলা, পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে বা প্রবল জ্বর দেখা দিলে তা ভাইরাস নয়, বরং ব্যাকটেরিয়া বা পরজীবী সংক্রমণের কারণে হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এই সময় একটু সচেতন হলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। এই গরমে আমাদের দৈনিক জলের চাহিদা অন্তত দুই থেকে তিন লিটার। তবে সেই জল হতে হবে অবশ্যই বিশুদ্ধ। জল ফুটিয়ে তারপর ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার পাত্রে সংরক্ষণ করে পান করা সবচেয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী। অনেকে ফিল্টার ব্যবহার করেন, তবে ফোটালে সব ধরনের জীবাণু স্পোর-সহ ধ্বংস হয়। ঘরের বাইরে, বিশেষ করে রাস্তায় বিক্রি করা শরবত বা অন্য কোনো পানীয় পান করা যাবে না।

যে কারণে হয় : অস্বাস্থ্যকর ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন, যেখানে-সেখানে ও জলের উৎসের কাছে মলত্যাগ, সঠিকভাবে হাত না ধোয়া, অপরিচ্ছন্ন উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ দোকান, রেস্তোরাঁ বা বাড়িতে ফ্রিজের পচন ধরা খাবার গ্রহণের ফলে ডায়েরিয়া দেখা দিতে পারে।

করণীয় : ডায়েরিয়া হলে শরীর দ্রুত জলশূন্য হয়ে যায় এবং রক্তে লবণের তারতম্য দেখা দেয়। এই দুটোকে রোধ করাই ডায়েরিয়ার মূল চিকিৎসা।

প্রাথমিক পরিচর্যা :

- প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর বয়স অনুযায়ী পরিমাণমতো খাবার স্যালাইন পান করাতে হবে।
- খাবার স্যালাইন ছাড়াও ডাবের জল, ঘরে তৈরি তরল খাবার যেমন ভাতের মাড়, চিড়া ভেজানো জল, তাজা ফলের রস ইত্যাদি দেওয়া যেতে পারে। তবে ফলের রসের কারণে ফ্রুক্টোজের প্রভাবে রোগীর পেট ফেঁপে বিপত্তির সৃষ্টি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- স্বাভাবিক খাবারও পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে।
- বুকের দুধ খাওয়া শিশুরা খাবার স্যালাইনের পাশাপাশি বুকের দুধও খাবে।

জটিলতা : এছাড়া পাতলা পায়খানার সঙ্গে রক্ত, জ্বর, প্রচণ্ড পেটব্যাথা বা কামড়ানো, পিচ্ছিল মল, মলত্যাগে ব্যথা ইত্যাদি থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে হবে। প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া, চোখ গর্তে ঢুকে যাওয়া বা জিভ ও ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া, রোগীর মধ্যে অশান্তি বা নিস্তেজ ভাব জলশূন্যতার লক্ষণ দেখা দিলে বা বমির কারণে পর্যাপ্ত স্যালাইন না খেতে পারলে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে।

ডায়েরিয়া প্রতিরোধে করণীয় : ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হলে বা সুস্থ হয়ে ওঠার পর অবশ্যই তরলজাতীয় খাবার বেশি খেতে হবে। যেমন ডাবের জল, স্যালাইন ইত্যাদি বেশি বেশি পান করতে হবে।

- যতই লোভনীয় হোক, পচা-বাসি খাবার খাওয়া যাবে না।
- হাত ভালোভাবে পরিষ্কার করে খাবার খেতে হবে।
- ছয় মাসের কম বয়সি শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়াতে হবে।
- যদি সম্ভব হয় তবে শিশুকে অসুস্থ লোক বা রোগী থেকে দূরে রাখতে হবে।
- খাবার তৈরি ও শিশুকে খাওয়ানোর আগে এবং মলত্যাগের পর সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করতে হবে।
- বোতলের দুধ পান করানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ছোটো বাচ্চাদের হাত দিয়ে যতটা সম্ভব কম খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।
- পাকা পায়খানা বা স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে হবে।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হতে পারে। তবে সেটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শে খেতে হবে। নিজের ইচ্ছেমতো ওষুধ খাওয়া যাবে না। এতে বিপদ আরও বাড়তে পারে।
- যদি চোখ বসে যায়, রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অচেতন হয়ে পড়ে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় বা বারবার বমির কারণে জল বা স্যালাইন বেরিয়ে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যান।

এই সময় একটু সচেতন হলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। □

বাঙ্গালি শিক্ষকদের এরকম অপমান আগে কেউ করেনি

বিশ্বপ্রিয় দাস

এই লেখাটা যখন শুরু করছি, তখন শিক্ষা দুর্নীতির জল অনেকটাই গড়িয়ে গেছে। সঙ্গে যোগ হয়েছে গোরু পাচার, কয়লা পাচার, বালি খাদান দুর্নীতি, সঙ্গে আরও অনেক কিছু। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের অনেক রথী মহারথীরা প্রমাদ গুনছেন, এই বুঝি তাঁদের ডাক এলো। রাজ্য শাসক দলের সুপ্রিমো বিরোধী আন্দোলনে জেরবার। একেবারে কোণঠাসা অবস্থায় তিনি ঘরে আর বাইরে সামাল দিতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন। তার মধ্যেই গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো সংস্কারপন্থী নতুন তৃণমূল দলের আগমন ঘোষণা। সেই ঘোষণা আবার যুবরাজকে সামনে রেখে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দলের পুরনোদের অনেককেই সম্মান বাঁচাতে সরে যেতে হয়েছে বা কায়দা করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের অনেকেই বলেন, এখন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের অন্দরে অনেক গোষ্ঠী। এর মধ্যে শক্তিশালী গোষ্ঠী হচ্ছে রাজ্যের শাসক দলের বর্তমান সেকেন্ড ম্যান, যুবরাজ। সুপ্রিমো গোষ্ঠীর যিনি মাস্টার মাইন্ড ছিলেন সেই মহাসচিব এখন দুর্নীতির পাঁকে পড়ে গরাদের ভিতরে।

রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমোকেও শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থায় আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে শক্তিশালী যুবরাজ গোষ্ঠীর কাছে। রাজনৈতিক মহলের যুক্তি, সুপ্রিমো যখন কাছের মানুষ মহাসচিবকে ছেঁটে ফেলতে বিন্দুমাত্র সময় নিলেন না, অথচ গোরু, কয়লা, পাথর পাচার-সহ নানা অভিযোগে আটক বীরভূমের বাহুবলীর পাশে দাঁড়ালেন তখনই বোঝা গেছে যে তিনি এখন ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করে বাতিলের খাতায় চলে যেতে শুরু করেছেন। তাঁর সরকার এখন অনেকটাই দিশেহারা। সেই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার পথটাও তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। একের পর এক ঘটনা ঘটেই চলেছে।

এবার আসা যাক রাজ্যের শাসকদের সরকারি শিক্ষাস্তরে বঞ্চনার কথায়, নিয়োগ দুর্নীতির বিষয়ে। রাজ্যের কয়েক হাজার শিক্ষকপ্রার্থী রাস্তায় বসে প্রায় ৬০০ দিন অনশন করে আন্দোলন করে চলেছেন। অন্যদিকে এই শিক্ষকদের এভাবে বঞ্চিত করে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সরকারের মন্ত্রী থেকে আমলা ও নেতারা এখন হয় জেলের অন্তরালে, নয়তো পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। প্রাক্তন পর্ষদ সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যকে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। সিবিআইকে লুক আউট নোটিশ জারি করতে হচ্ছে তাকে খুঁজে বের করতে। কোটি কোটি টাকার এই নিয়োগ দুর্নীতির জন্য পর্ষদের দুই বড়ো কর্তাও

ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের হাতে বন্দি।

একদিকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশ-সহ ধর্মতলার আরেকটি জায়গায় এই সব চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের যোগ্যতার নিরীখে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি না পেয়ে, রাস্তায় নেমে চাকরি চেয়েই চলেছেন। অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ টাকায় তাঁদের চাকরি বিক্রি হয়ে যাবার ঘটনা সামনে আসায় তাঁদের আন্দোলনের ঝাঁজ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের দায়ের করা মামলায় ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে চাকরি বিক্রির সেই দুর্নীতি। আর এই দুর্নীতির নেপথ্যে থাকা সেই মহারথীরা প্রমাদ গুনছেন কবে জেলের অন্তরালে যাবেন। শিক্ষকদের এরকম অপমান বাঙ্গলার প্রশাসনিক ইতিহাসে এর আগে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। এখন এমন অবস্থায় পড়েছেন রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষক যে তাঁদের নিজেদের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিতে গিয়ে সংকোচে হচ্ছে। কেননা তারা ভয় পাচ্ছেন, কেউ যদি কটাক্ষ করেন চাকরি পাবার ক্ষেত্রে অসৎ উপায় নিয়েছেন কিনা? সেই বিষয়টাকে চলতি প্রসঙ্গে টেনে এনে তাকে যদি কিছু বলেন!

এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় টেট দুর্নীতির কথা এখন বহু চর্চিত। এসএলএসটি শিক্ষকতা চাকরি প্রার্থীদের বিষয়টাও আপামর মানুষ জানেন। এসএসসি'র বিষয়টা না হয় একটু হালকা ভাবে নেওয়া গেল। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক পেশার অপমান যে এভাবে করা যায়, সেটা রাজ্যের বর্তমান শাসকদল বেশ ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রাথমিকে যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন আজও এই রাজ্যে মেলে না। যদিও তাঁরা সেই যোগ্যতা বাধ্যতামূলক ভাবে অর্জন করেছেন। কেন্দ্র নির্দেশিত সেই যোগ্যতামান, অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিকে পঞ্চাশ শতাংশ নম্বর, ডিইএলএড পাশ করলেও সরকারি খাতায় প্রাথমিক শিক্ষকরা আজও মাধ্যমিক। আর সেই অনুসারে বেতন পান। গত আট বছরে প্রাথমিকে একমাত্র জীবনে পদন্নোতি, প্রধান শিক্ষক পদে উন্নীতকরণ বন্ধ। ফলে প্রাথমিক শিক্ষকরা সব দিক দিয়ে বঞ্চিত ও অপমানিত।

রাজ্যের শিক্ষকদের সঙ্গে এই সঙ্গে অপমানিত হয়েছেন কয়েক লক্ষ সরকারি কর্মী। রাজ্যের সরকারি কর্মীদের এখনো মেলেনি প্রাপ্য মহার্ঘ্য ভাতা। তারা দীর্ঘ আন্দোলন চালিয়ে, আইনি লড়াইয়ে জিতেও প্রাপ্য পাননি। তাঁদের প্রাপ্য এর মধ্যেই ৩৪ শতাংশ পৌঁছেছে। রাজ্যের শাসক দল নানা উপায়ে এই প্রাপ্যের বিষয়টাকে এড়িয়ে যেমন চলেছে তেমনি আদালতকেও পাত্তা দিচ্ছে না। আর রাজ্যের সরকারি কর্মী সমেত শিক্ষকরাও সেই সঙ্গে বঞ্চনার স্বীকার হয়ে চলেছেন এই অর্থনৈতিক ভয়ংকর সমস্যার সময়ে। রাজ্য সরকার বলেছে কোষাগারে টাকা নেই। তাহলে উৎসব, মেলা, খেলায় এত খরচা করা কেন? কয়েকদিন আগে 'খেলা হবে' দিবসের নামে কোটি কোটি টাকার রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হলো সরকারি বদান্যতায়। আবার দুর্গাপুজোয় ৪৩ হাজার পুজো কমিটিকে ৬০ হাজার করে টাকা দেবার ঘোষণা করে, রাজ্যে কোষাগার থেকে ২৫৮ কোটি টাকা খরচ করার ঘোষণা করা হলো। তেমনি বাঙ্গালির দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর সম্মান পাবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি আদিখ্যেতা দেখানোর নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করে কার্নিভাল বা ধন্যবাদ জ্ঞাপন মিছিল করার কি কোনো দরকার ছিল? এর আগে কি বারোয়ারি পুজো হয়নি না এই টাকা না পেলে বাঙ্গালির দুর্গাপুজো হবে না? এভাবে বাঙ্গালির পুজোকেও প্রকারান্তরে রাজনৈতিক রঙ লাগিয়ে অপমান করল রাজ্যের বর্তমান শাসক দল।

দুর্গাপুজোর প্রসঙ্গ যখন এল তখন একটি বিষয় বলে রাখা প্রয়োজন বলে মনে হলো। এক বাঙ্গালি গবেষক, তপতী গুহ ঠাকুরতার কৃতিত্বকে হাইজ্যাক করে নিজের নামে চালিয়ে, রাজ্যের শাসক দল নির্লজ্জভাবে দুর্গাপুজোকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে প্রচারের আলোয় নিজেদের আলোকিত করতে চলেছে। কী সেই বিষয়? সেটা হচ্ছে বাঙ্গালির প্রাণের উৎসব, দুর্গাপুজোর ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়া এটি সম্ভব হয়েছে এই তপতী দেবীর চেষ্টায়। তিনি ২০০৩ সাল থেকে বাঙ্গালির প্রাণের উৎসবকে নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে গেছেন। ২০১৮-১৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিমন্ত্রক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে। সংগীত নাটক অ্যাকাডেমি থেকে সামান্য গ্রান্ট নিয়ে ২০টি ছবি ও একটি ১০ মিনিটের ভিডিয়ো তৈরি করেন তিনি আর সেটা সহ ইউনেস্কোর একটি ফর্ম ফিল আপ করেন। আর এরপরেই আবহমান অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিভাগে স্বীকৃতি পায় আমাদের প্রাণের উৎসব দুর্গাপূজা। এই স্বীকৃতি পাবার ব্যাপারে রাজ্যের বর্তমান সরকারের কোনো ভূমিকাই নেই। তাকে সম্মাননা না জানিয়ে কোটি কোটি সরকারি টাকা অবব্যবহার করে, রাজনৈতিক রঙে আমাদের প্রাণের দুর্গাপূজাকে কলুষিত করছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। এটাকে আপামর বাঙ্গালির অপমান বলা হলেও কম হবে। ■

ঘুষ দিয়ে যারা শিক্ষক হয়েছেন, তারা কী স্কুলে পড়ানোর যোগ্য?

ভবানীশঙ্কর বাগচী

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত প্রাইমারি স্কুলগুলো দুর্নীতির খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে। ওই স্কুলগুলোয় যারা শিশুদের পড়ানোর চেষ্টা করেন, ধমক দেন, কিঞ্চিৎ মারধরও করেন, তারা কি আদৌ শিক্ষক হবার যোগ্যতা রাখেন? আগে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করতে হবে।

যেভাবে দিনের পর দিন এ রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে নতুন নতুন চুরি-ডাকাতির খবর উঠে আসছে তাতে একটু নাড়াচাড়া করলে দেখা যাবে, বেশিরভাগ গ্রামের স্কুলগুলিতে পাঁচজনের মধ্যে তিনজনই হয় টাকা দিয়ে, টেট (টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট) পাশ না করেই চাকরি পেয়েছেন। নয়তো নেতা-মন্ত্রীর পায়ে তেল মাখিয়ে সুযোগ পেয়েছেন। অথবা নেতা-মন্ত্রীর আত্মীয় পরিজন হওয়ার সুবাদে 'শিক্ষক' তকমা গায়ে এঁটে বাইক হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

কিন্তু চুরি তো আর ধামা চাপা পড়ে থাকে না। দু-কান, পাঁচ কান হতে হতে তা একদিন কোর্টের এজলাসে এনে দাঁড় করায় চোরকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ নিয়ে তৃণমূল সরকারের পুকুরচুরি এবার জনসমক্ষে উঠে এসেছে। বীরভূমে যে কেউকেটার মাথায় অক্সিজেন কম যায় বলে শুনেছি তার মেয়ে ২০১২ সালে টেট পাশ না করেই বাড়ির কাছের স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। সেই সুকন্যা মণ্ডল আবার স্কুলে ছাত্র পড়াতে যেতে পছন্দ করতেন না। হাজিরা খাতায় তার নামের পাশে যথারীতি 'প্রেজেন্ট' পড়ে যেত। পেয়ে যেতেন মাসে মাসে মোটা মাইনে। শুধু সুকন্যা মণ্ডল নয়, অনুব্রতর জ্ঞাতিভাই সুমিত মণ্ডল, ভাইপো সাত্যকি মণ্ডল, অনুব্রত পিএ অর্ক দত্তরাও টেট পাশ না করেই শিক্ষক হবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। এসব দেখেশুনে মনে হয় আমরা এমন এক মান্ধাতার আমলে পড়ে আছি, যেখানে স্কুলে ছাত্র পড়ানোর শিক্ষক অমিল! হাতে-পায়ে ধরে, সাধ্য-সাধনা করে পাশের বাড়ির টেঁপি, বুঁচি, লাল্টু, বিল্টুকে ধরে আনতে হচ্ছে! যাদের নামে অভিযোগ জমা পড়েছে আদালতে মিডিয়ার দৌলতে তাদের নামই জানতে পারছে পশ্চিমবঙ্গবাসী। কিন্তু এর বাইরেও যে কতজন আছে তার ইয়ত্তা নেই।

> **শিক্ষক নিয়োগ যতদিন না দুর্নীতিমুক্ত হচ্ছে ততদিন স্কুলের পড়ুয়াদের ওই স্কুল ফেল করা অযোগ্য শিক্ষকদের কাছেই পড়তে হবে।**

ব্যক্তিগত পরিসরেই এমন বহু দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। আমার এক বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি গত বছর এমনই একজনের হদিশ দিয়েছিলেন। তাঁরই এক আত্মীয়া ক্লাস সিক্স ফেল করে মাধ্যমিকে টেনেটুনে থার্ড ডিভিশন পেয়েছিল। কোনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রচুর টাকা দিয়ে বিএড-এ ভর্তি হয়। কিন্তু বিএড প্রতিষ্ঠানটি বেআইনি হওয়ায় কিছুদিন পরেই তা বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েটির বিএড আর করা হয়নি। কয়েকদিন বেসরকারি হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট সংস্থায় চাকরি করার পর একদিন হঠাৎ খবর পাওয়া গেল সে হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছে। এই খবরে স্বভাবতই মেয়েটির বন্ধু সার্কেল অবাক হয়েছিল। কারণ এত নিম্ন মেধার পড়ুয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া মানে চাঁদ ছোঁয়ারই নামান্তর। পরবর্তীকালে জানা যায়, শাসক দলের এক মন্ত্রীর বদান্যতায় হাতে-পায়ে ধরে অথবা অন্য কোনও উপায়ে স্কুলে শিক্ষকতার চাকরিটি সে বাগিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, স্বজনপোষণের কোটায় জনৈক মন্ত্রী কোন্ কুমিরটিকে খালে ঢোকালেন? বন্ধুটি মনমরা হয়ে বলেছিল, সুপারিশে শিক্ষক হওয়া ক্লাস সিক্স ফেল মেয়েটি নাকি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতাও দেখে!

একবার ভাবুন, 'পি' ডিভিশনে পাশ করা একজন দিদিমণির কাছে পড়তে যাচ্ছে আপনার বাড়ির ভবিষ্যৎ। যারা নিজেরাই অকৃতকার্য তারা শিক্ষক সেজে রং-চং মেখে স্কুলে গিয়ে পড়ুয়াদের যথার্থ শিক্ষা দিতে পারছে কি? আমার আপনার বাড়ির ছেলে-মেয়েরা কাদের কাছে শিক্ষার পাঠ নিচ্ছে?

হুগলির এক শহরের উপকণ্ঠে এক গ্রামের এক পরিবারে এগারো জন চাকরি পাওয়ার কথা লোকের মুখে মুখে ঘুরছে। সবাই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। কানাঘুঁষোয় জানা যায়, এই পরিবারটি আবার সেখানকারই এক মন্ত্রীর জ্ঞাতিগুষ্টি। তাদের মধ্যে একটি ছেলে ক্লাস নাইনে দু'বার ফেল করেছিল। সে এখন বড়ো একটা বাইক হাঁকিয়ে স্কুলে যায় শিক্ষকতা করতে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান ছবিটা এরকমই। এখানে সব কিছুই এখন 'ফেলো কড়ি মাখো তেল'। যদি তা না পারো তাহলে রাজপথ খোলাই আছে। সেখানে গিয়ে বিক্ষোভ করো।

অবশ্য শিক্ষা নিয়ে দুর্নীতি শুধুমাত্র যে তৃণমূল সরকারের আমলেই হয়েছে তা নয়। বামেরাও একই দোষে দুষ্ট। তারাও খেয়েছে। কিন্তু প্রমাণ রাখেনি। ২০০৯ সালেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার তৎকালীন এক দাপুটে নেতা-মন্ত্রীর পছন্দের সাংবাদিক হওয়ার পুরস্কার স্বরূপ তাঁর স্ত্রী স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন। এরকম অঢেল উদাহরণ আছে। লিখতে গেলে একটা গোটা বই হয়ে যাবে। টাকার বিনিময়ে যাদের চাকরি দেওয়া হলো, সেইসব অযোগ্য চাকুরিজীবীরা রাজপথে বসে থাকা বিক্ষোভরত যোগ্য চাকুরি প্রার্থীদের বঞ্চিত করল। এই নিম্ন মেধার, তথাকথিত শিক্ষকরা ছাত্রদের পরীক্ষার খাতার মূল্যায়ন বা স্ক্রুটিনি আদৌ করেন কি, না ঢালাও নম্বর ছড়িয়ে দেন? যাতে মুড়ি-মুড়কির দর একইরকম হয়। সঙ্গত কারণেই গত কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী।

একবার জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এক অধিকর্তা আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'তেমন মেধা নেই পশ্চিমবঙ্গে। সবাই পড়ে, নম্বর পেতে আসে। পাশ করতে আসে। কেউ গবেষণা করতে চায় না।' শিক্ষাব্যবস্থার যে মেরুদণ্ডে দুর্নীতির ঘুণ ধরেছে, সেখানে গবেষক হওয়ার মতো মেধা বিকশিত হওয়া দুঃসাধ্য। এটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ গবেষণা যে কেউ করেন না এমন তো নয়। এই সেদিন খবরে খবরে ছয়লাপ, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলের স্নাতকোত্তরের ছাত্রী কণা সরকার বাঙ্গলার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় চপ শিল্পের প্রভাব নিয়ে গবেষণাপত্র জমা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে চপশিল্পের মাহাত্ম্য শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কণা। যে কারণে গবেষণাপত্রে তাঁর অনুপ্রেরণার কথা ছাপাতেও ভোলেননি ওই চপ গবেষক। এগিয়ে এই পশ্চিমবঙ্গ। এভাবেই এগোচ্ছে বাঙ্গলা। খুবই লজ্জার বিষয় যে, কয়েক দশক ধরে এই বাঙ্গলা থেকে

আইএএস ক্যাডার তৈরি হচ্ছে না। এক সময় স্লোগান ছিল— কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ।' তৃণমূলের ১২ বছরের রাজত্বে তা এখন পরিবর্তিত হয়েছে। এখন 'দুর্নীতি আমাদের ভিত্তি, চপশিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ'— এটাই প্রযোজ্য।

পাহাড়-প্রমাণ দুর্নীতির চাপে ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিদিনই সামনে আসছে নতুন নতুন অভিযোগ। যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল মারা হয়েছে। তাতেই ভনভনিয়ে বেরিয়ে আসছে ভীমরুলের ঝাঁক। সেই ২০১৩ সাল থেকেই কানাঘুষো শোনা যেত 'ওমুকের বাড়ির একসঙ্গে ১১ জন প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পেয়েছে। তমুকের বউ, ভাইঝি, ভাইপো হাইস্কুলে চাকরি পেয়ে গেল! কী করে পেল? পার্টি করে বলেই পেয়েছে' ইত্যাদি। কিন্তু

কেউই এতদিনে সাহস করে আদালতে অভিযোগ করতেন না। সরকার বাহাদুরের 'গাঁজা কেসে' ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে।

আসলে রাজ্যের আইন কক্ষগুলিতে এতদিন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো একজন আইনরক্ষকের বড্ড অভাব ছিল। এতদিনে সেই ঘাটতি পূরণ হয়েছে। যদিও অরুণাভ ঘোষের মতো আইনজীবীদেরও কোনও অভাব নেই এ বঙ্গে। যারা উঠতে বসতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো সেঁটে দেন, তাঁরাও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে ঢালাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনওরকম পদক্ষেপ করার প্রয়োজন মনে করেননি। চাকরিপ্রার্থীরা তাদের অভিযোগ নিয়ে বিভিন্নজনের কাছে তদবির করেছেন, কিন্তু তেমন আশার আলো দেখেননি। হতাশ হয়ে তাঁরা রাজপথে বসেছেন, তাদের ন্যায্য চাকরির দাবিতে। যে চাকরিগুলো তৃণমূল সরকারের ডাকসাইটে নেতারা মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে অযোগ্যদের কাছে বিক্রি করেছেন অথবা নিজের জ্ঞাতি, আত্মীয়-পরিজনদের পাইয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে যে বেলাগাম দুর্নীতি করেছে তৃণমূলের কেষ্ট-বিস্টুরা, তাতে এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে। সেই ভাঙন আপাতত রোধ করার চেষ্টা করছেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো সাহসী বিচারপতিরা।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যে নগদ টাকার পাহাড় এবং হীরে-জহরতের ভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করেছে, অনেকেরই ধারণা তা এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির বেআইনি টাকা। নীচুতলার দলীয় কর্মীদের দালাল হিসেবে ব্যবহার করে উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষকের চাকরি বিক্রি করা হতো। সেই টাকা দালাল মারফত জমা হতো পার্থ-অর্পিতার জিম্মায়। সেখান থেকে বখরা যেত উপরমহলে। নগদ টাকা উদ্ধার হলো এই সেদিন।

একটু ভাবুন ২০১২ সাল থেকে সেদিন অবধি কত পরিমাণ টাকা বগলদাবা করেছে রাজ্যের শাসকদল!

বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেই দুর্নীতির পেঁয়াজের খোসা একটার পর একটা ছাড়াতে শুরু হয়েছে যখন, সেখানে বাধ সাজতে হাজির হলেন আইনজীবী অরুণাভ ঘোষ। বর্ষীয়ান অরুণাভ ঘোষ চিরকাল অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই পছন্দ করতেন। তাঁর এই ইউএসপির জন্যই ২০০১ সালে ভরা বামজমানায় তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক হওয়ার পরও তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেন। স্পষ্টবাদী বলেই তিনি পরিচিত। কিন্তু সেই অরুণাভ ঘোষ হঠাৎ করে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে অনুব্রত মণ্ডলের মেয়ের আইনজীবী হয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আইনের জ্ঞান নিয়ে চ্যালেঞ্জ করছেন, এমন দৃশ্য বিরল। অবশ্য রাজনীতিতে সবই ঘটে। কে যে কখন, কার কোলে ঝোল টেনে কথা বলবে তা বলা যায় না। যদিও সুকন্যা মণ্ডলের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ প্রমাণ-সহ উচ্চ আদালতে জমা পড়েছে। এক্ষেত্রে তারিখের পর তারিখ বাড়ানো ছাড়া অরুণাভবাবুর আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। টেট ও এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির শিকড় অনেক গভীরে চারিয়ে গেছে। তার সাফ-সাফাই করতে আরও সময় বয়ে যাবে। তত দিন কিন্তু স্কুলের পড়ুয়াদের ওই স্কুল ফেল করা অযোগ্য শিক্ষকদের কাছেই পড়তে হবে। যে শিক্ষকদের কেউ কেউ আবার ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে সন্ধি বিচ্ছেদ লিখবেন, ধনুষ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার। এতে লজ্জা, ঘৃণা পেলে চলবে না। কারণ তৃতীয়বারের জন্য আবার আমরাই খাল কেটে কুমির এনেছি। যথাসর্বস্ব খোওয়াবার জন্য।

ফ: ৪

কেশব ভবনে 'বাংলায় সঙ্ঘকাজের ইতিহাস' ও স্বস্তিকার পঁচাত্তর বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ২০ আগস্ট কলকাতার মানিকতলাস্থিত কেশব ভবনে 'বাংলায় সঙ্ঘকাজের ইতিহাস' ও স্বস্তিকা পত্রিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক অজয় কুমার নন্দী, শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশনের অরিন্দম সিংহ রায়, অজয় গোয়েল। প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অরিন্দম সিংহ রায়। প্রধান বক্তা হিসেবে শ্রীদত্ত বলেন, 'বাংলায় সঙ্ঘকাজের ইতিহাস' প্রকাশ করে স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট নবীন প্রজন্মের স্বয়ংসেবক ও সঙ্ঘশুভানুধ্যায়ীদের দীর্ঘদিনের একটি চাহিদা পূরণ করেছে। পুস্তকটি বঙ্গ প্রদেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত

হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানে একক গীত পরিবেশন করেন শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী।

অনুষ্ঠানে প্রথম ভাগে স্বস্তিকার ৭৫বর্ষ উদ্‌যাপন স্বাগত সমিতির পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করেন স্বস্তিকার মুদ্রক ও প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল। সভাপতি– সৌরভ দাস। সহ সভাপতি– অরিন্দম সিংহ রায়, অজিত জানা, অজয় গোয়েল, দেবাশিস লাহিড়ী, রবিরঞ্জন সেন। সম্পাদক--অভিজিৎ চক্রবর্তী। সহ সম্পাদক– ড. তিলক রঞ্জন বেরা, কর্ণধর মালী, আনন্দ দাস। হিসাব রক্ষক– তপন সাহা, সহ– জয়রাম মণ্ডল। সদস্য– রবিরঞ্জন সেন, ড. জিষ্ণু বসু, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, তরুণ পণ্ডিত, ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার, বীরেন পাল, সঞ্জয় বসু, সুকুমার নাথ, সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। উপদেষ্টা– অজয় নন্দী, নৃপেন্দ্রপ্রসন্ন আচার্য, ডাঃ বনমালী ভড়, সজ্জন ভজনকা, রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুল বিশ্বাস, ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী, হৃষীকেশ সাহা। বাংলায় সঙ্ঘকাজের ইতিহাস গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন ড. বিজয় আঢ্য। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বস্তিকার সম্পাদক ড. তিলকরঞ্জন বেরা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল।

উত্তর দমদমে সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট উত্তর দমদম নগর সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজ এবং স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব উপলক্ষ্যে নিমতা থানার নিকট ললিতাদেবী সরস্বতী শিশুমন্দিরে ভারতমাতার পূজা ও হোমযজ্ঞের আয়োজন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এলাকার প্রবীণ স্বয়ংসেবক অ্যাডভোকেট মানস মিত্র। বক্তব্য রাখেন স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ দক্ষিণবঙ্গের সংযোজক অধ্যাপক নির্মল মাইতি, বিশিষ্ট অরবিন্দ গবেষক পরিমলেন্দু বিকাশ রায়, স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পূর্বক্ষেত্রের সহ সংযোজক অম্লানকুসুম ঘোষ, সচেতন সনাতনী হিন্দু সমাজের সহ সভাপতি সুবীর বিশ্বাস। সংগীত পবিবেশন করেন দক্ষিণবঙ্গ স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের সহ সংযোজক অশোক পাল চৌধুরী ও দেবজ্যোতি নাগ। এই সময় উপস্থিত সকলের হাতে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের পত্রক বিতরণ করা হয়।

এই উপলক্ষ্যে সকাল ১১.৩০ মিনিটে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৪ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়। স্থানীয় চিকিৎসক ডাঃ সুজিত ব্যানার্জির তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। যজ্ঞ সমাপন্তে সবাইকে খিচুড়ি প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সিউড়ী শহরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

তারাশঙ্কর-স্মৃতি সাহিত্যসমাজের উদ্যোগে গত ৩১ জুলাই বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। দীপমন্ত্র ও শঙ্খধ্বনির আবহে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়, অধ্যাপক নারায়ণপ্রসাদ ভাট্টাচার্য প্রমুখ। সুব্রত নন্দন তাঁর স্বরচিত গানে সুর দিয়ে তারাশঙ্কর বন্দনা করেন। অপরাজিতা চৌধুরী ও তপন দে সরকার তারাশঙ্করের গান পরিবেশন করে শ্রোতাদের অভিভুত করেন। লাভপুরের দিশারী নাট্যসংস্থা এবং দুর্গাপুর নাট্যগোষ্ঠী তারাশঙ্করের দুটি শ্রুতিনাটক পরিবেশন করে। তারাশঙ্করের রাজনৈতিক প্রতিবাদী সত্তার কথা তুলে ধরেন অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায়। অধ্যাপক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় তারাশঙ্করের বক্তব্য বিষয়গুলির সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী হবেন। সাহিত্য সমাজের সম্পাদক বলেন, ‘তারাশঙ্করের জন্মের ১২৫ বছর হয়ে গেল তবু তারাশঙ্কর আজও অবহেলিত। তারাশঙ্করের নামে সরকার একটি চেয়ার সংরক্ষণ করেনি। তিনি নিজে দীর্ঘ চার খণ্ডে তারাশঙ্কর জীবনী রচনা করেছেন কিন্তু প্রকাশকের অপেক্ষায় তা আজও অবহেলিত। তারাশঙ্কর তাঁর সমগ্র জীবন ধরে জেলাকে, রাজ্যকে, দেশকে যা দিয়ে গেছেন তার মূল্যায়ন হওয়া দরকার।’ সহযোগিতা পেলে তারাশঙ্করের প্রতি দেশের দৃষ্টি ফেরাতে সক্ষম তিনি।

সভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়।

দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২০ আগস্ট দক্ষিণবঙ্গ সংস্কার ভারতীর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনে। সংস্থার ভাব সংগীত দিয়ে সভা শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ গোখলে, কেন্দ্রীয় সম্পাদক তথা প্রদেশ সহ সভানেত্রী নীলাঞ্জনা রায়, পূর্বাঞ্চল ক্ষেত্র প্রমুখ নীলকণ্ঠ রায় (অধীর), প্রদেশ সহ সভাপতি ডঃ স্বপন মুখার্জী, প্রদেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সুভাষ ভট্টাচার্য এবং প্রদেশ সাধারণ সম্পাক ভরত কুণ্ডু। মঞ্চস্থ অতিথিদের বোলপুরের জনজাতি সংস্কৃতির ছোঁয়া লাগানো বিভিন্ন প্রাকৃতিক সামগ্রী দিয়ে বরণ করেন বীরভূম জেলা শাখার প্রতিনিধিরা। সভায় বার্ষিক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন যথাক্রমে সম্পাদক ভরত কুণ্ডু ও কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু। সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। এরপর ২০২২-২৩ সালের জন্য সভাপতি ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত এবং কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডুকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত করা হয়। কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ গোখলে কেন্দ্রীয় কোষ টোলির সদস্য ও প্রদেশের পরামর্শদাতা হিসেবে ভরত কুণ্ডুর নাম ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে সন্ধ্যায় নন্দলাল বসুর শিল্পকর্ম এবং ভারতের সংবিধান নিয়ে শুরু হয় আলোচনা সভা। কলাভবন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক আর. শিবকুমার ভারতীয় সংবিধান লেখন ও তার শিল্পকর্ম বিষয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন নন্দলাল বসু কীভাবে সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ভারতীয় সংস্কৃতির ঘটনাপ্রবাহ চিত্রিত করেছেন। আলোচনা সভার সভাপতি বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়ও এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন।

সভার দ্বিতীয় দিনে সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ২০২২-২৩ সালের কার্যকরী সমিতি ঘোষণা করা হয়। সভাপতি ঃ ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। সহ সভাপতি ঃ নীলাঞ্জনা রায়, ডঃ স্বপন মুখোপাধ্যায় ও সুভাষ ভট্টাচার্য। সাধারণ সম্পাদক ঃ তিলক সেনগুপ্ত। সহ সাধারণ সম্পাদক ঃ অমিত দে। সম্পাদক মণ্ডলী ঃ অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা চক্রবর্তী ও রীণা ব্যানার্জী। সংগঠন সম্পাদক (বিভাগ) ঃ উদয় কুমার দাস। কোষাধ্যক্ষ ঃ গোপাল কুণ্ডু। সদস্যমণ্ডলী ঃ প্রবীর ভট্টাচার্য, সায়ন্তন ঘোষ, মেহেন্দি চক্রবর্তী ও সুদীপ দত্ত।

দ্বিতীয় পর্বে এসরাজ বাদন করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে প্রখ্যাত শিল্পী দেবায়ন মজুমদার। তালবাদ্যে সঙ্গত করেন কৌস্তভ চন্দ্র। সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অভিজিৎ গোখলে। সমগ্র কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা ও রূপসজ্জায় ছিলেন বীরভূম জেলা শাখার প্রতিনিধিরা। সভা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন তিলক সেনগুপ্ত।

স্বাধীনতার পঁচাত্তর বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠান

স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্তি উদ্‌যাপন সমিতির উদ্যোগে গত ১৪ আগস্ট নদীয়া জেলার শান্তিপুর শহরের বন্ধু সভা হলে এক দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের

প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারের সদস্যদের সংবর্ধনা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া শান্তিপুরস্থ অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে অঙ্কন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, সেমিনার ও নৃত্যগীতে অংশগ্রহণকারী ৬৭ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

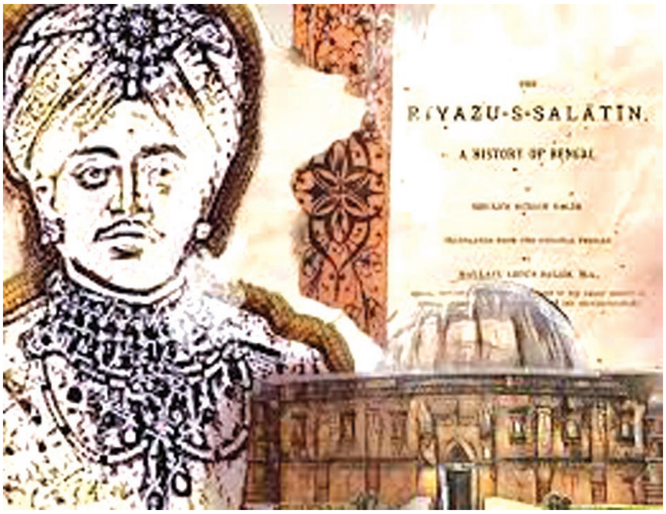

ইতিহাসের সিলেবাসে ব্রাত্য রাজা গণেশ

সূর্য শেখর হালদার

বিদ্যালয় পাঠ্য ইতিহাস বই ও বিভিন্ন বাংলা কাব্য-নাটকে আমাদের শেখানো হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাঙ্গলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়েছিল। এটা ঠিক যে সেদিন বাঙ্গলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশীর প্রান্তরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে পরাভূত এবং পরে বন্দি হয়ে মিরজাফর পুত্র মিরনের হাতে নিহত হন। সিরাজকে বাঙ্গলার স্বাধীন নবাব বলা হয়। কিন্তু তিনি কি আদৌ স্বাধীন ছিলেন বা বাঙ্গালি ছিলেন? বাংলা কি তাঁর মাতৃভাষা ছিল? এইসব প্রশ্নের উত্তর আমরা পাঠ্য ইতিহাস বা সাহিত্যে পাই না। বিশেষ কারণবশত সিরাজউদ্দৌলার বংশ পরিচয় সাধারণত জানানো হয় না। বাঙ্গালি ছাত্র-ছাত্রী জানতে পারে না যে সিরাজের পূর্বপুরুষরা ছিলেন বহিরাগত। সিরাজের পিতা মির্জা মহম্মদ হাশিম ছিলেন আলিবর্দি খানের বড়ো ভাই হাজি আহমেদের কনিষ্ঠ সন্তান। এই হাজি আহমেদের পিতা মির্জা মহম্মদ মাদানি ছিলেন তুর্কি বংশজাত এবং আওরঙ্গজেবের এক দূর সম্পর্কিত ভাইয়ের সন্তান। এর অর্থ হলো ব্রিটিশের করায়ত্ত হবার আগে বাঙ্গলা ছিল তুর্কি-আরবি বংশোদ্ভূত বহিরাগত সুলতানের দ্বারা শাসিত। এই বহিরাগত শাসন বাঙ্গলায় শুরু হয় ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে যেদিন তুরস্কের ঘোর প্রদেশের শাসক মহম্মদ ঘুরির সেনাপতি বখতিয়ার খলজি লখনৌতি বা নদীয়া দখল করে তাঁর শাসন আরম্ভ করেন। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর বাঙ্গলা পরাধীন ছিল। নবাব-সুলতানরা স্বাধীন হলেও বাঙ্গলার মানুষরা স্বাধীন ছিলেন না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে শুধু শাসকের পরিবর্তন হয়। এক ধরনের বহিরাগত শাসকের শাসনের অবসান ঘটে এবং আরেক ধরনের বহিরাগত শাসকের শাসন কায়েম হয়।

সাড়ে পাঁচশো বছর কালখণ্ডে বাঙ্গলা মূলত আরবি বা তুর্কি সুলতানের দ্বারা শাসিত হলেও বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে বাঙ্গলার ভূমিপুত্র-কন্যাদের শাসন কায়েম হয়েছিল। মুষ্টিমেয় যে কয়জন প্রকৃত বাঙ্গালি শাসক এই সময়ে স্বাধীন রাজত্বের পত্তন করেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রাজা গণেশ। তাঁর পুরো নাম মহারাজ গণেশ নারায়ণ ভাদুড়ী। তিনি ১৪১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে আনুমানিক ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বাঙ্গলা জুড়ে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গলার ইলিয়াস শাহি সুলতানের বংশধরকে উৎখাত করে রাজা গণেশ তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খাজা নিজামউদ্দিন আহমেদ রচিত তবকাত-ই-আকবরী (১৫৯২-৯৩), মহম্মদ কাশিম শাহ রচিত তারিখ-ই-ফিরিস্তা (১৬১২), মাসির-ই-রহিমী প্রভৃতি গ্রন্থে গণেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজা গণেশের সঙ্গে ইব্রাহিম শর্কির সংঘর্ষের উপর লিখিত গ্রন্থ সংগীত শিরোমণি, চীন সম্রাট কর্তৃক বাঙ্গলার রাজসভায় প্রেরিত জনৈক সদস্যের লেখা গ্রন্থ শিং-ছা-শংলান, আরবি ঐতিহাসিক ইবন-ই- হজরের গ্রন্থ, দরবেশ নূর-কুতুব-আলম ও আশরফ সিমনানীর পত্রাবলী, দনুজমর্দনদেব ও মহেন্দ্র দেবের মুদ্রা রাজা গণেশের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান। অনেক ফার্সি গ্রন্থতে রাজা গণেশকে কানস্ লেখা হয়েছে যার থেকে অনেকে অনুমান করেন যে রাজা গণেশের প্রকৃত নাম ছিল কংস। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ফার্সি ভাষায় গ-কে-ক-লেখার প্রবণতা থেকেই এইরকম ভ্রম সৃষ্টি হয়েছে। মহারাজ গণেশের জন্ম হয় একটাকিয়ার কাশ্যপ গোত্রীয় ভাদুড়ী বংশে। এই বংশের সুবুদ্ধি নারায়ণ রায় ভাদুড়ী একডালা দুর্গের যুদ্ধে দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলককে পরাজিত করেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন অনুযায়ী রাজা গণেশ বর্তমান বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুরের ভাতুরিয়ার জমিদার ছিলেন। আবার ফ্রান্সিস বুকানন বলেন যে তিনি উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের হাকিম ছিলেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে ভাতুরিয়া অঞ্চলে তাঁর জমিদারি ছিল। জমিদার রূপে তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন এবং প্রথম জীবনে ইলিয়াস শাহী

বংশের সুলতানদের অন্যতম আমির ছিলেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন শিহাবউদ্দিন বায়াজিদ শাহ, আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের আমলে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জমিদার গণেশ নারায়ণই ছিলেন বাঙ্গলার প্রকৃত শাসক। ১৪১৪-১৫ খ্রিস্টাব্দে গণেশ নারায়ণ ফিরোজ শাহকে পরাজিত ও নিহত করে নিজস্ব বাহিনীর সাহায্যে বাঙ্গলায় মুসলমান শাসনের উচ্ছেদ করেন এবং বাঙ্গলার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্য অনুসারে রাজা গণেশের রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। কারণ তৎকালীন মুসলমানদের বিরোধিতা। তৎকালীন বাঙ্গলার মুসলমানরা একজন হিন্দুর শাসন মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁরা দরবেশদের নেতৃত্বে অশান্তি শুরু করেন। কিন্তু দক্ষ প্রশাসক রাজা গণেশ কঠোরভাবে বিদ্রোহ দমন করেন এবং কয়েকজন দরবেশকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এতে দরবেশরা আরও ক্রুদ্ধ হলেন। এই দরবেশদের নেতা ছিলেন নূর কুতুব আলম। তিনি পরাক্রান্ত সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট প্ররোচনামূলক ভাষায় পত্র প্রেরণ করেন। ইব্রাহিম শর্কি ছিলেন জৌনপুরের সুলতান। তিনি পত্র পাঠ করে যখন জানলেন যে রাজা গণেশ ঘোরতর অত্যাচারী ও মুসলমানের শত্রু, তখন তিনি সসৈন্যে বাঙ্গলা আক্রমণ করে রাজা গণেশকে উচ্ছেদ করতে মনস্থ করেন।

জৌনপুর থেকে বাঙ্গলায় আসার পথে ত্রিহুত বা মিথিলা হয়ে আসতে হতো। এই ত্রিহুত বা মিথিলা ছিল জৌনপুরের সামন্ত রাজ্য। কিন্তু সেই সময় ত্রিহুতের রাজা দেবসিংহকে উচ্ছেদ করে তাঁর স্বাধীনচেতা, ধার্মিক পুত্র শিব সিংহ রাজত্ব করছিলেন। শিব সিংহ রাজা গণেশের মিত্র ছিলেন এবং তিনিও দরবেশদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেন। সে কারণে ইব্রাহিম শর্কি প্রথমে ত্রিহুত আক্রমণ করেন। যুদ্ধে শিব সিংহের পরাজয় ঘটে এবং তিনি বন্দি হন। ইব্রাহিম শিব সিংহের বদলে দেবসিংহকে আনুগত্যের শর্তে ফের ত্রিহুতের রাজা পদে আসীন করেন। এরপর ইব্রাহিম বাঙ্গলায় পদার্পণ করে রাজা গণেশের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ইব্রাহিমের বিশাল সৈন্যের কাছে গণেশ নারায়ণও পরাজিত হন। উপরন্তু তাঁর এক পুত্র যদু নারায়ণ পিতার পক্ষ ত্যাগ করে ইব্রাহিমের পক্ষ নেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় জালালউদ্দিন। ইব্রাহিম ত্রিহুতে পুত্রের বদলে পিতাকে সিংহাসনে আসীন করেছিলেন।

সেইরকম বাঙ্গলায় তিনি পিতার বদলে পুত্রকে রাজত্বের ভার দিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যান। এতে বাঙ্গলায় ফের মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৪-১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি এই ঘটনা ঘটে। তবে রাজা গণেশ ছেড়ে দেওয়ার পাত্র ছিলেন না। ইব্রাহিম চলে যাবার পরে সুযোগ বুঝে রাজা গণেশ ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন এবং বাংলাদেশে আবার গৈরিক ধ্বজ উড্ডীন হয়। এই ঘটনায় দরবেশ নূর আলম এতটাই মর্মাহত হন যে তিনি কিছুদিনের মধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এরপর সুযোগ বুঝে রাজা গণেশ দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে শাসন করতে থাকেন। দনুজমর্দনদেব আসলে রাজা গণেশ ছিলেন কিনা সেই নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। তবে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে দনুজমর্দনদেব আর রাজা গণেশ একই ব্যক্তি। দনুজমর্দনদেব নামটি পাওয়া যায় সেই সময়ের মুদ্রাতে। এই মুদ্রাগুলিতে একদিকে রাজার নাম— দনুজমর্দনদেব ও অন্যদিকে টাঁকশালের নাম, উৎকীর্ণ হওয়ার সাল এবং চণ্ডীচরণপরায়ণস্য বাংলা অক্ষরে লেখা রয়েছে। এই লেখা থেকে বোঝা যায় যে মুদ্রাগুলি ১৩৩৯ শকাব্দ (১৪১৭-১৮ খ্রিস্টাব্দ) এবং ১৩৪০ শকাব্দের (১৪১৮-১৯ খ্রিস্টাব্দ) সময় তৈরি করা। কিছুকাল রাজত্ব করার পর গণেশের মৃত্যু হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে রাজা গণেশ তাঁর বিধর্মী পুত্র যদুকে পুনরায় হিন্দু ধর্মে নিয়ে আসেন এবং তাকে বন্দি করে রাখেন। গণেশের মৃত্যুর পরে জালালউদ্দিন নাম নিয়ে যদু সিংহাসনে আসীন হন। তবে ১৩৪০ শকাব্দের কিছু কিছু মুদ্রায় মহেন্দ্র দেব নামে এক হিন্দু রাজার নাম পাওয়া যায়। এই মুদ্রাগুলি ও দনুজমর্দনদেবের মুদ্রাগুলি একই রকম। এর থেকে বোঝা যায় যে এই রাজা মহেন্দ্র দেব গণেশের উত্তরসূরী। আবার তারিখ-ই-ফিরিস্তা অনুযায়ী গণেশের আরেক পুত্র ছিল। এর থেকে অনুমান করা যায় যে রাজা গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর আরেক পুত্র মহেন্দ্র দেব সিংহাসনে আসীন হন কিন্তু জালালউদ্দিন ওরফে যদু তাঁকে সহজেই রাজ্যচ্যুত করে সিংহাসন অধিকার করেন। জালালউদ্দিন ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৪৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং তিনি মুসলমান সুলতান রূপেই বাঙ্গলাতে রাজত্ব চালান।

রাজা গণেশ স্বল্পকাল রাজত্ব করলেও দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে তিনি উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু অংশ নিজের অধিকারে আনেন। ফিরিস্তা অনুযায়ী তিনি সুশাসক ছিলেন। তাঁর কার্যকলাপ বুঝিয়ে দেয় যে তিনি ছিলেন কূটনীতিজ্ঞ ও প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী। চণ্ডী দেবীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা তাঁর মুদ্রা থেকে জানা যায়। আবার পদ্মনাভের বংশধর জীব গোস্বামীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি গৌড় ও পাণ্ডুয়ায় বেশ কিছু স্থাপত্য নির্মাণ করান। শোনা যায় তিনি দনুজমর্দনদেব রূপে দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা গণেশ আজকের বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস বইতে ব্রাত্য। বাঙ্গলার মুসলমান শাসকদের কথা সেখানে বিশদ উল্লেখ থাকলেও গণেশের নাম বাঙ্গলার ছাত্র-ছাত্রীদের শেখানো হয় না। ইতিহাস বইগুলিতে এইরূপ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হয় যে মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের অধীনে হিন্দু প্রজারা খুশিতে ছিল। কিন্তু রাজা গণেশের ইতিহাস দেখিয়ে দেয় একজন হিন্দু রাজাকে উচ্ছেদের জন্য মুসলমান দরবেশ ও সুলতানরা কতদূর যেতে পারতেন। সেই সঙ্গে বেশ কিছু হিন্দু রাজপুরুষ অর্থ ও ক্ষমতার লোভে মুসলমান দরবেশ শাসকদের সহায়তা করেছিলেন। ত্রিহুত রাজ্যের দেব সিংহ কিংবা গণেশের পুত্র জালালউদ্দিন এই তথ্য প্রমাণ করে। আজকের বাঙ্গলাতেও দেব সিংহ বা যদুরা বর্তমান। তাঁরা হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস বদলাতে চায়, আরবি সংস্কৃতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করতে চায় এবং প্রশাসনকে বহিরাগত আরবি সংস্কৃতির ধারকদের হাতে তুলে দিতে চায়।

তথ্যসূত্র : *বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ) : শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার। প্রথম প্রকাশ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।*

কলকাতার ইতিহাস ও সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীনাথ

রক্তিম দাশ

যে রাস্তার নাম ইংরেজরাও পরিবর্তন করতে সাহস পায়নি, ভারতের স্বাধীনতার পর এক মুহূর্তে সেই চৌরঙ্গী রোডের নাম পরিবর্তন করে মুছে দিয়ে করা হলো জওহরলাল নেহরু রোড। ঘৃণ্য এক অপচেষ্টায় ভুলিয়ে দেওয়া হলো কলকাতার ইতিহাসের পাতা থেকে সনাতন ধর্মের এক গৌরবজনক অধ্যায়কে। স্বাধীন ভারতের উন্মাদনায় হারিয়ে গেলেন কলকাতার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীনাথ। ইতিহাসের পাতা থেকে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শহর কলকাতা তখনও সেভাবে গড়ে উঠেনি। আজকের ময়দান ও এসপ্ল্যানেড ছিল সে সময় বাঘের আবাস ভূমি। এখানে সে সময় ছিল তিনটি ছোটো গ্রাম— চৌরঙ্গী, বিরজি ও কোলিম্বা। নাথ সম্প্রদায়ের 'চৌরঙ্গীনাথ'-এর নাম থেকেই এই অঞ্চলের নাম হয় 'চৌরঙ্গী'। চৌরঙ্গীনাথই মা-কালীর একটি মুখাবয়ব নিয়ে আদি কালীঘাট মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চৌরঙ্গী তখন জলাভূমি। ধানক্ষেত আর বাঁশঝাড়ে ভরা চৌরঙ্গী গ্রাম জঙ্গল দ্বারা গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস এই জঙ্গলে হাতি নিয়ে বাঘ শিকার করতে আসতেন। প্রাচীন কলকাতার প্রথম দিকের ম্যাপে ধর্মতলা বা এসপ্ল্যানেড থেকে রোড টু চৌরঙ্গী দেখা যায় আজও। সেই রাস্তা থেকে আজকের রবীন্দ্রনাথের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ক্যাথলিন ব্লিচেডেন তাঁর 'ক্যালকাটা, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট' বইয়ে।

কল্যাণী মল্লিকের 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধন প্রণালী' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৪৬) বইটি থেকে জানা যায়, নাথ সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গীনাথ। বিমাতার আদেশে হস্তপদহীন হওয়ার কারণে পাল বংশের দেবপাল রাজার পুত্র 'চৌরঙ্গী' নামে পরিচিতি লাভ করেন। মনে করা হয়, বঙ্গের পাল রাজাদের

তৃতীয় রাজা দেবপালই চৌরঙ্গীনাথের পিতা। ড. মোহন সিংহের মতে, তিনি শালবাহন রাজের পুত্র পূরণ-ভগত। চৌরঙ্গীনাথের পূর্ব নাম পূরণ। নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ‘পূর্ণচন্দ্র’ নাটকটি তাঁকে নিয়ে লিখেছিলেন। তিব্বতীয় বৃত্তান্ত অনুসারে চৌরঙ্গীনাথ খ্রিস্টীয় নবম শতকে বর্তমান ছিলেন। দেবপালের পুত্র বা পৌত্র কেউই রাজত্ব করেননি। মনে করা হয়, চৌরঙ্গীনাথের রাজ্য ত্যাগই এর কারণ।

মদনগোপাল নাথের ‘যোগধর্ম ও যোগিজাতি’ (১৯৯৪) বইটি থেকে পাওয়া যায়, কালীঘাটের মা-কালীর মূর্তি সর্বপ্রথম প্রাচীন কলকাতার গভীর জঙ্গলে থাকা নাথযোগীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধযোগী চৌরঙ্গীনাথের আশ্রমে পাওয়া গিয়েছিল। একটি গোরু ওই আশ্রমের একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন নিজের স্তন থেকে দুধ নিঃসরণ করত। এটি লক্ষ্য করে চৌরঙ্গীনাথের সন্দেহ হয়। তিনি ওই স্থানে খনন করে মাটির গভীর থেকে একটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মা-কালীর মূর্তি উদ্ধার করেন। কিন্তু মূর্তির নিম্নাংশ অনেক চেষ্টা করেও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পরে চৌরঙ্গীনাথের গুরুভাই নাথগুরু গোরক্ষনাথ সাধারণের উপসনার জন্য গঙ্গার তীরে প্রশস্ত স্থানে একটি ছোটো মন্দির নির্মাণ করে ওই মূর্তিটি স্থাপন করেন। যা পরবর্তীতে ভারতের ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম কালীঘাট রূপে পরিচিতি লাভ করে। প্রাচীন কলকাতার বাসীন্দারা সিদ্ধযোগী চৌরঙ্গীনাথকে গুরুর আসনে বসিয়ে ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্যও ছিল। তৎকালীন সময়ে বাঙ্গলায় আগত সাধু-সন্তরা ধর্মতলা অঞ্চলের পাশ দিয়ে জঙ্গলের পথে চৌরঙ্গীনাথের আশ্রমে যেতেন। আশ্রমে আগত তীর্থযাত্রী ও সাধু-সন্তদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ওই আশ্রমে। পরে সেখান থেকে তাঁরা কালীঘাট মন্দির দর্শন করে দক্ষিণে ডায়মন্ডহারবারের পথ ধরে সাগর দ্বীপে নাথ সম্প্রদায়ের কপিলমুনির আশ্রমে যাতায়াত করতেন। চৌরঙ্গীনাথ ধর্মতলা থেকে কালীঘাট পর্যন্ত তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করেছিলেন।

পরবর্তীতে এই সিদ্ধযোগীর তিরোধানের পর তাঁর আশ্রমটি শ্রীহীন হয়ে পড়ে। কলকাতা মহানগরীর বৃদ্ধি ও কোলাহলের কারণে আশ্রমে যোগ সাধনার পরিবেশ বিঘ্নিত হতে থাকে। একে একে সাধু-সন্তরা এই আশ্রম পরিত্যাগ করে চলে যান। মহানগরী কলকাতার সম্প্রসারণের চাপে চৌরঙ্গীনাথের এই কর্মভূমিটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কালের প্রভাবে। চৌরঙ্গীনাথের স্মৃতি বলতে এখন রয়েছে তাঁর সমাধি মন্দিরটি। প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে কলকাতার ময়দান থানার পেছনে রয়েছে চৌরঙ্গীনাথের সমাধি। ময়দান থানার ঠিক পাশে একটা গলি চলে গেছে, তার ভেতরে গেলে মন্দিরটি বাঁ হাতে পড়বে। এখানেই অনাদরে শায়িত রয়েছেন বাঙ্গালির বিশ্বমানব চৌরঙ্গীনাথ। শংকরের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস থেকে তৈরি সিনেমা চৌরঙ্গীতে কলকাতায় অন্যতম প্রধান এই রাস্তাটির ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা তো দূরের কথা, উলটে স্বাধীনতার আনন্দে ইতিহাসকে ভুলিয়ে দিয়ে রাস্তার নাম পরিবর্তন করে দেওয়া হলো জওরলাল নেহরু রোড!

সনাতন ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীনতম আদিনাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীর সমাধি। দেখাশোনার জন্য কেউ ছিলেন না। ওখানে একটি কাঁচা কাঠামো ছিল বলে জানালেন তিন পুরুষ ধরে এই সমাধি মন্দিরের বর্তমান পূজারি ধর্মেন্দ্র পাঠক। ওঁদের পরিবারের দয়াতেই দরমার বেড়া দেওয়া সমাধিটি আজ কোনোক্রমে পাকা মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে। ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দিয়ে নিখিল ভারত রুদ্রজ ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়, জওহরলাল নেহরু রোডের নাম পরিবর্তন করে পূর্বেকার নামে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। মেট্রোর ময়দান স্টেশনের নাম রাখা হোক সাধক চৌরঙ্গীনাথ। যদিও এই আবেদনের কোনও উত্তর আজও আসেনি বলে জানিয়েছেন নাথ মিশনের সম্পাদক বরুণ নাথ। কলকাতার অন্যতম স্থপতি চৌরঙ্গী নাথকে ভুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা আজও অব্যাহত। তাঁর সমাধি মন্দিরের আশপাশ দখল করে তৈরি হয়েছে একাধিক সরকারি স্থাপনা। ময়দান থানার ভবন দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে এই ঐতিহাসিক স্থানটিকে। চৌরঙ্গীনাথের ব্যবহৃত পুকুরটি আজ নন্দনের ভিতরে বদ্ধ জলাশয়। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের কাছে অবিলম্বে এই ঐতিহাসিক স্থানটি সংরক্ষণ করার দাবি তুলেছেন নাথ মিশন। তাঁরা চাইছেন, এই সমাধি মন্দিরের প্রবেশ পথটি উন্মুক্ত করে দেওয়া হোক অবিলম্বে। যাতে রাস্তা থেকে বিনা বাধায় পুণ্যার্থীরা এই মন্দিরে আসতে পারেন। নাথ সম্প্রদায়ের কপিলানী পন্থের মোহন্ত পির বিজয়নাথ বলেন, ‘আমি সমাধি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। এখানকার অবস্থা দেখে আমরা খুব ব্যথিত। ভারতের সনাতন ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের অন্যতম চৌরঙ্গীনাথের সমাধি মন্দির অনাদরে পড়ে আছে। এটা সিদ্ধস্থান। কেন চৌরঙ্গী রোডের নাম পরিবর্তন করা হলো? প্রশাসন এবিষয়ে কী করে সেটা আমরা দেখব। সরকারকে মনে রাখতে হবে, বাঙ্গলায় ৪৫ লক্ষ নাথ সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। তাঁদের শুধু আবেগ নয়, কলকাতার মানুষের আবেগও এর সঙ্গে জড়িত। ইতিহাসকে এভাবে চেপে রাখা যায় না।’ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পার হয়ে গেল। ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা কি ফিরিয়ে দিতে পারি না কলকাতার প্রকৃত ইতিহাসকে? যার প্রতিষ্ঠাতা কোনও ইংরেজ বা বাবু দেশীয় জমিদার নন, ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্য চৌরঙ্গীনাথ। □

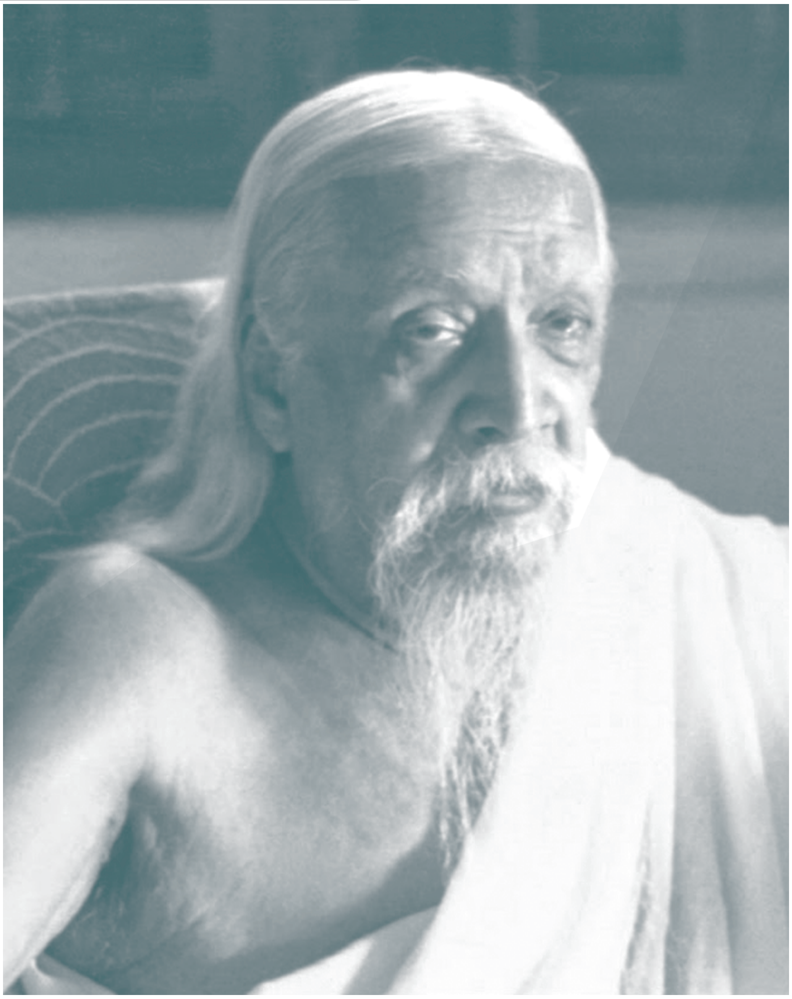

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক বিকাশে তাঁর অবদান যেমন উজ্জ্বল তেমনি রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্য তাঁর ভূমিকা বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লেখাই যায় না। বিপ্লবী আন্দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় আত্মত্যাগের প্রেরণা জুগিয়েছে 'আনন্দমঠ'-এ বর্ণিত দেশের মাতৃরূপ এবং সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে জাতীয়তা ও ধর্মের মধ্যে ঐক্যসূত্রের চিত্রণ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের সম্পর্ক দেখিয়েছিলেন আর ঋষি অরবিন্দ সত্যের খোঁজে একটু এগিয়ে পৌঁছে গেলেন চরম সূত্রে— ভারতবর্ষের ধর্মই ভারতবর্ষের জাতীয়তা।

১৮৯৩ সালটি ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় বিশ্বধর্মসম্মেলনে ভারতীয় ধর্মের বাণী তুলে ধরেন আর একই বছরে পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারঙ্গম হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন অরবিন্দ।

ঋষি অরবিন্দের জীবন ও দর্শন

পিন্টু সান্যাল

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের যতরকম প্রচেষ্টা হয়েছে সেগুলি মূলত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। (১) প্রথমে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য ভারতবর্ষ কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণকে প্রতিহত করেছে সেই ঐক্যের প্রাণ ভারতবর্ষের সনাতন শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করা। (২) যে বৈদেশিক শাসনের জন্য ভারতবর্ষের মানুষের মধ্যে আপন সংস্কৃতি সম্পর্কে উদাসীনতা, অনুকরণের মানসিকতা, হীনমন্যতা, দারিদ্র্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আগে সেই শক্তিকে পরাজিত করে প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, পরে ভারতীয়ত্বের বিকাশ। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক শক্তির জাগরণের প্রথম প্রয়াস আমরা দেখতে পায় মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর মাধ্যমে, তারপর ভারতবর্ষের মহিমা বিশ্বমঞ্চে ধ্বনিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের তেজস্বী বক্তৃতায়। ভারতবাসী উপলব্ধি করে ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা শুধু ভারতবর্ষের নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য।

ভারতে ফিরে বরোদায় চাকরির সময় থেকে আলিপুর বোমা মামলায় কারামুক্তির সময় পর্যন্ত একদিকে তিনি যেমন স্বাধীনতালাভের সবরকম প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, অন্যদিকে নিজের লেখনী শক্তির মাধ্যমে ভারতবর্ষের ধর্ম ও জাতীয়তাবোধের মধ্যেকার বন্ধনকে প্রচার করেছেন। নিজের ভাই বারীন ঘোষকে সামনে রেখে চলেছে গুপ্তসমিতির মাধ্যমে বিপ্লবী আন্দোলন আর গীতাকে সামনে রেখে বিপ্লবীদের মধ্যে যে যোগশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে

ফঃ ৫

দিয়ে নিজেকেও নিয়ে গিয়েছেন। শ্রী অরবিন্দের চোখে রাজনৈতিক স্বাধীনতা শুধুমাত্র একটি জাতির মুক্তি নয়; তাঁর মতে 'আমাদের উত্থান কেবল আর্যজাতির উত্থান নহে— আর্যচরিত্র, আর্যশিক্ষা, আর্যধর্মেরপ উত্থান' (ধর্ম ও জাতীয়তা)। তাই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি যে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের 'আধ্যাত্মিকতা' তার প্রমাণ শ্রীঅরবিন্দের জীবন।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল ১৯০৫ থেকে ১৯১০— এই চার বছর, কিন্তু তাঁর প্রভাব পড়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত পন্থার ওপরই। তাই স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ঋষি অরবিন্দের পরিচয় কোনোভাবেই ছোটো নয়, কিন্তু তাঁর নামের আগে আমরা 'ঋষি' বলতেই অভ্যস্ত, কারণ ভারতবর্ষ 'ঋষি' পরিচয়কেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করেছে। আর ভারতীয় দর্শনকে ইউরোপীয় দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে আধুনিকভাবে উপস্থাপিত করার কারণে তিনি নিঃসন্দেহে, আক্ষরিক অর্থেই আধুনিক ভারতের একজন 'ঋষি'। ঋষি অরবিন্দের জীবনের শেষ চল্লিশ বছর কাটে পণ্ডিচেরীতে যোগসাধনায় এবং সেই সময়ের উপলব্ধি তিনি লিপিবদ্ধ করেন 'The Life Divine' (দিব্যজীবন) পুস্তকে। প্রাচীন ভারতের সত্যদ্রষ্টা ঋষির মতোই 'অতিমানস তত্ত্ব' উপলব্ধিই ছিল শ্রী অরবিন্দের 'সিদ্ধিলাভ'।

মাত্র ৭ বছর বয়সে পিতার ইচ্ছায় প্রবাসী হয়েছিলেন। পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ চেয়েছিলেন তাঁর চার পুত্র ইংরেজের আদব- কায়দায় বড়ো হয়ে উঠুক, ভারতীয় সংস্কৃতির বিন্দুমাত্র প্রভাব যেন তাদের উপর না পড়ে। অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির প্রসারে সেই সময়ের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। উপনিষদের গভীর জ্ঞান ছিল রাজনারায়ণ বসুর, 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধে যে সঞ্জীবনী সমিতির উল্লেখ পাওয়া যায় তার প্রতিষ্ঠাতা রাজনারায়ণ বসু। ১৪ বছর পর দেশে ফিরে বরোদায় চাকরির সময় প্রতি বছর ছুটিতে অরবিন্দ দেওঘরে যেতেন মাতামহের সঙ্গে সময় কাটাতে। তাই একদিকে পিতার ইচ্ছায় ইউরোপীয় ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাসে অরবিন্দ যেমন পারদর্শী হয়েছিলেন; তেমনই মাতামহের প্রভাবে ভারতীয় শাস্ত্র, সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

ঋষি অরবিন্দের সাহিত্য প্রতিভা তাঁর এক স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবি রাখে। বিলেতে থাকাকালীন তাঁর গ্রিক লাতিন ভাষায় দক্ষতা বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা লাভ করেছিল। মাত্র ১৪ বছর বয়সে প্রথম ইংরেজি কবিতা লিখেছেন। বরোদায় থাকার সময় তিনি সংস্কৃত ও বাংলা শিখেছেন। মারাঠি, গুজরাটি, হিন্দিও ভালো বুঝতেন। এই সময়ে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী নাটকের ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার উপর ভিত্তি করে ইংরেজি কবিতা লেখেন।

ইউরোপীয় ভাষা ও ভারতীয় ভাষা বিশেষ করে সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই সমস্ত দর্শনের মূল গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল শ্রীঅরবিন্দের— এই সুযোগ সমসাময়িক বিখ্যাত অনেক দার্শনিকদের ঘটেনি। বিকৃত অনুবাদের উপর নির্ভর করে দর্শনের আলোচনার অপবাদ থেকে শ্রীঅরবিন্দ মুক্ত ছিলেন। বাংলা ভালো বলতে পারতেন না বলে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ'-এর সন্ন্যাসী সন্তানদের দেশভক্তির আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। অরবিন্দ আনন্দমঠের অনুরূপ ভবানী মন্দির নামক আশ্রমের কল্পনা করেন এবং 'ভবানী মন্দির' পুস্তকে শক্তি উপাসনার মাধ্যমে ভারতবাসীকে রজোগুণের বিকাশের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়ে বিশ্বজননী ভবানীর পূজা দ্বারা কী করে স্বাধীনতা লাভ করতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ এই পুস্তকে তা দেখিয়েছেন।

'ভবানী মন্দির'-এ লেখেন—

আহ্বান পাঠাও তবে
যেথা যত আছ সনাতন
ভারত-সন্তান
মাভৈঃ মন্ত্রে জাগো সংগ্রামের সাজে।
কোথা ধনু খড়্গ তব? চিরঞ্জয় জাগো
জাগো সুপ্তসিংহ জাগো
জননী জাগ্রতা।। (৩১) (অনূদিত)

অরবিন্দ 'ধর্ম ও জাতীয়তা' বইয়ে লিখেছেন— 'প্রায়ই যাঁহারা জাতি-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপ সিংহ, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলেই শক্তি উপাসক বা তান্ত্রিক যোগীর শিষ্য ছিলেন।'সন্ন্যাস গ্রহণ না করলেও পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অরবিন্দ ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীকেও সাধারণ স্ত্রীদের সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল। দেশে ফেরার প্রায় দশ বছরের মধ্যেই ১৯০২ সালে বাঙ্গলায় গুপ্তসমিতির প্রতিষ্ঠা করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের গুপ্তসমিতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনে সচেষ্ট হন। ১৯০৬ সালে বরোদা ত্যাগের পূর্বে প্রতি বছর পূজার ছুটিতে অরবিন্দ কলকাতায় আসতেন।

বরোদায় থাকাকালীন কংগ্রেসের গঠন, পদ্ধতি ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা করে পুণের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন— 'New Lamps for Old'। সেসময়ে কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল শুধুমাত্র শাসন সংস্কার, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ইচ্ছা ছিল জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জানানো এবং শুধুমাত্র উচ্চবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ কংগ্রেসের সঙ্গে সাধারণ জনগণের যোগস্থাপন।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের সৃজনী শক্তিকে জনজাগরণের কাজে লাগাতে 'বন্দেমাতরম্' ও 'যুগান্তর' পত্রিকায় রাষ্ট্রভাব প্রচার করতে থাকেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে দেশবাসীর একাত্মতা ও দেশভক্তির উদ্দীপনাকে কাজে লাগাতে সশস্ত্র আন্দোলনকে গতি দেওয়ার চেষ্টা

করেন। ১৯০৬ সালে বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত কম বেতনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

রাজনৈতিক পথে স্বাধীনতালাভের জন্য একদিকে জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চকে কাজে লাগান এবং পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করানোর দাবিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সরব হন, আর অন্যদিকে গুপ্তসমিতির সঙ্গে যুক্ত যুবকদের উৎসাহ দিতে থাকেন। বাল গঙ্গাধর তিলক ও শ্রীঅরবিন্দের উদ্যোগেই কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন ভেস্তে যায় এবং কংগ্রেস তথাকথিত নরম ও চরমপন্থী দলে ভাগ হয়ে যায়। তাঁর নিজের কথায়, 'very few people know that it was I (without consulting Tilak) who gave the order that led to the breaking of the Congress and was responsible for the refusal to join the new-bangled Moderate Convention which were the two decisive happenings at Surat". (Sri Aurobindo on Himself and on the Mother)

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর উপর দায়ভার এলে, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য যাতে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'-এর ক্ষতি না হয় সেজন্য পরিষদের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে জামিনে মুক্ত অরবিন্দ ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, 'ভারতকে তোমরা বড়ো করো। একদিন ভারত ছিল জগতের গুরু; তখন জগৎ ভারতের জ্ঞানের প্রতীক্ষায় থাকতো। আবার যেন ভারত আগের ন্যায় উন্নত শিরে জগৎ-সভায় দাঁড়াতে পারে। জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছাত্রদের শুধু জ্ঞানদান নয়, কিংবা জীবিকা অর্জনের জন্য ছাত্রদের যোগ্য করে তোলা নয়। তারা মাতৃভূমির জন্য কাজ করবে, দরকার হলে দুঃখবরণ করবে— এমন সব মায়ের সন্তান তৈরি করাই জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য।' বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নমস্কার' কবিতায়। অরবিন্দের ত্যাগ, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও নির্ভীকতাকে রবীন্দ্রনাথ প্রণাম জানান এইভাবে— 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। অরবিন্দ-প্রশস্তির সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ দেশের বিপদে চুপ করে থাকা ভীরু নেতাদের তিরস্কার করে বলেন—

'যে নপুংস কোনোদিন
চাহিয়া ধর্মের পানে নির্ভীক স্বাধীন
অন্যায়েরে বলেনি অন্যায়...
সেই ভীরু নতশির, চিরশান্তি তারে
রাজকারা বাহিরেতে নিত্য কারাগারে।'

শ্রীঅরবিন্দের জীবনে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি সম্ভবত আলিপুর বোমা মামলা— এই ঘটনার পরে শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রসেবার অন্য এক পথ বেছে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ গ্রেপ্তার হন ১৯০৮ সালের ২ মে; তার আগে ২৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তারিখে স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে লেখেন— 'আমার এইখানে এক মুহূর্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, কংগ্রেস সংক্রান্ত সকল কাজের ভার আমার উপর, বন্দেমাতরমের গোলমাল মিটাইবার ভার আমার উপর। আমি আর পেয়ে উঠছি না। তাহা ছাড়া আমার নিজের কাজও আছে।' 'নিজের কাজ' অর্থাৎ সাধন-ভজন। আলিপুর বোমা মামলা অরবন্দিকে নিভৃতে যোগসাধনার সুযোগ এনে দেয়। এই মামলাতে তল্লাশির সময় শ্রীঅরবিন্দের লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ তাঁর বিরুদ্ধে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে একটি প্রবন্ধ 'What is extreamism' সম্পর্কে জজ বিচক্রফট্ মন্তব্য করেন 'As an essay the article is a splendid piece of writing'— অভিযুক্তের লেখনী প্রতিভার প্রশংসা করে বিচারকের এহেন মন্তব্যের আর একটি উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

মামলা চলাকালীন অরবিন্দ নিজের অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি 'কারাকাহিনি' বইতে লিপিবদ্ধ করেন। কারাবাসের সময় শ্রীঅরবিন্দের 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' অনুভব হয় অর্থাৎ জেলের দেওয়াল, পুলিশ, বিচারক, বন্দি, গাছ সবার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পান। কারামুক্তির পর তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণে শ্রীঅরবিন্দ কারাবাসের (১৯০৮ সালের ৫ মে থেকে ১৯০৯ সালের ৫ মে) সময়ে তাঁর ভবিষ্যতের লক্ষ্য ও কাজ সম্পর্কে যোগসাধনায় প্রাপ্ত অন্তরাত্মার নির্দেশ জনসমক্ষে তুলে ধরেন— 'যখন তুমি বাইরে যাবে তোমার জাতিকে সর্বদা এই বাণী শোনাবে যে সনাতন ধর্মের জন্যেই তারা উঠছে, নিজেদের জন্যে নয়, পড়ন্ত সমস্ত জগতের জন্যেই তারা উঠছে। আমি তাদের স্বাধীনতা দিচ্ছি জগতের সেবার জন্যে। অতএব যখন বলা হয় যে, ভারত উঠবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম উঠবে। যখন বলা হয় যে, ভারত মহান হবে, তার অর্থ এই যে, সনাতন ধর্ম মহান হবে। যখন বলা হয় যে, ভারত নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে, তার অর্থ এই যে সনাতন ধর্ম নিজেকে বর্ধিত ও প্রসারিত করবে। এই ধর্মের জন্যে এবং এই ধর্মের দ্বারাই ভারত বেঁচে আছে। ধর্মটিকে বড়ো করে তোলার অর্থ দেশকেই বড়ো করে তোলা।'

সনাতন ধর্মের মহানতা নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ওই বক্তৃতায় (উত্তরপাড়া অভিভাষণ', ১৯০৯ সালের ৩০ মে) বলেন— '...হিমালয় ও সমুদ্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম গড়ে উঠেছে, এই পুণ্য ও প্রাচীন ভূমিতে আর্যজাতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এই ধর্মকে যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে রক্ষা করতে। ...এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানবজাতিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, ভগবান আমাদের কত নিকট, কত অপনার, মানুষ যত রকম সাধনার দ্বারা ভগবানের নিকে অগ্রসর হতে পারে সবই এর অন্তর্গত।' 'সনাতন ধর্ম, এইটিই হচ্ছে জাতীয়তা'— এই ছিল অরবিন্দের উপলব্ধি।

কারামুক্তির পর অরবিন্দ দেখলেন, দেশে এক বছর আগের সেই উদ্দীপনা আর নেই, চারিদিক যেন নিস্তব্ধ— এই নিস্তব্ধতাকে তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা বলে

মেনে নিলেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর অন্যতম সহযোগী বাল গঙ্গাধর তিলক মান্দালয়ের জেলে কারাবন্দি, বিপিনচন্দ্র পাল স্বেচ্ছায় প্রবাসী হয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ তখন একমাত্র সক্রিয় জাতীয়তাবাদী নেতা— গভর্নমেন্টের এক নম্বর শত্রু। তবু নিরাশ না হয়ে, 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ ও পাশ্চাত্যের অনুকরণ ত্যাগ করে সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, রাষ্ট্রপরিচালনা সর্বত্র প্রাচীন ভারতবর্ষের নিজস্বতা সম্পর্কে জনজাগরণের কাজ, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা চলতে থাকে। এই সময় তাঁর ভাষণ, উপনিষদের বিভিন্ন ঘটনার উদাহরণে প্রাচীন ভারতের কোনো ঋষির মতোই মনে হতো। এরই মধ্যে ভগিনীর নিবেদিতার বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানতে পারলেন গভর্নমেন্ট যে কোনো সময় তার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনতে পারে। যে সময় রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হলো অরবিন্দ তখন বাঙ্গলার বাইরে। প্রথম ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগরে দেড়মাস, তারপর পণ্ডিচেরীতে।

'কারাকাহিনি'তে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, 'আবার যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিব তখন সেই পুরাতন অরবিন্দ ঘোষ প্রবেশ করিবে না, কিন্তু একটি নূতন মানুষ নূতন চরিত্র লইয়া নূতন কর্মভার গ্রহণ করিয়া আলিপুরস্থ আশ্রম হইতে বাহির হইবে।'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সেই নতুন কাজের জন্য প্রায় ৪০ বছর কাটালেন পন্ডিচেরীতে। এর মধ্যে একাধিকবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ-সহ বিভিন্ন বিশিষ্টজনের অনুরোধ সত্ত্বেও রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেননি তাঁর অন্তরাত্মার নির্দেশিত বৃহত্তর লক্ষ্যপূরণের জন্য।

শ্রীঅরবিন্দ নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও যোগাভ্যাস করতেন কিন্তু সেই যোগ ছিল দেশের সেবায় নিজের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর জন্য কিন্তু পণ্ডিচেরী পর্বে যে অরবিন্দকে আমরা পাই তাঁর 'সাধনা' ছিল সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য। পণ্ডিচেরীতে যোগসাধনার সঙ্গেই চলতে থাকে 'আর্য' পত্রিকায় লেখার কাজ। তাঁর নিজের কথায়— 'The Arya is the the inellectual side of my work for the world'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯২৮ সালে ইউরোপ যাত্রার সময় পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নিজের বিবরণে লিখেছেন, 'প্রথম দৃষ্টিতেই বুঝলুম— ইনি আত্মাকেই সবচেয়ে সত্য করে চেয়েছেন, সত্য করে পেয়েছেন। সেই তাঁর দীর্ঘ তপস্যার চাওয়া ও পাওয়ার দ্বারা তাঁর সত্তা ওতপ্রোত। আমার মন বললে, ইনি এঁর অন্তরের আলো দিয়েই বাহিরের আলো জ্বালাবেন।

—অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে যে তপস্যার সামনে দেখেছিলাম সেখানে তাঁকে জানিয়েছে—

অরবিন্দ, রবীন্দ্র লহ নমস্কার

আজ তাকে দেখলুম তার দ্বিতীয় তপস্যার সামনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়— আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম— অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।'

জাতীয় কংগ্রেস ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে প্রথম পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব পাশ করে কিন্তু অরবিন্দের উদ্যোগেই স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব পাশ করানোর দাবিতে ১৯০৭ সালে জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজেদের একত্রিত করে 'মডারেট' কংগ্রেস থেকে পৃথক হন। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সঠিক পথ ও গতি দিতে শ্রীঅরবিন্দের প্রচেষ্টা ও সফলতা তুলনাহীন। একথা সেসময়ের জাতীয়তাবাদী নেতারা ও বিপ্লবীরা যেমন জানতেন, ব্রিটিশ সরকারও অরবিন্দের প্রভাব ও কাজ সম্পর্কে সবসময় সজাগ থাকতো। পণ্ডিচেরীতেও তাঁর কাজকর্মে নজর রাখার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করেছিল ইংরেজ সরকার। এইরকম অবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল কিন্তু যোগের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্বকে তাঁর 'দান' স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে তাঁর পরিচয়ের থেকেও বড়ো। তিনি প্রাণের 'বিবর্তন'কে, চেতনতত্ত্বের অভিব্যক্তির ক্রমান্বয়ে উন্নততর সোপানে পৌঁছানোর প্রক্রিয়া হিসেবে উপলব্ধি করেছেন এবং এই বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষ একদিন সজ্ঞানে সাধনার মাধ্যমে বিবর্তিত হয়ে দিব্য মানুষে পরিণত হবে। তাঁর মতে, জড় হতে প্রাণের উদ্ভব কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, জড়ের মধ্যেই চেতনশক্তি আছে অভিব্যক্তির অপেক্ষায়। 'অতিমানস তত্ত্বের' সাহায্যে বুঝিয়েছেন উপনিষদের সমর্থিত বাণী 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। দার্শনিক হিসেবে শ্রীঅরবিন্দ দেশের গণ্ডী পেরিয়ে সমগ্র মানবজাতির প্রতিনিধিরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাতে পেরেছিলেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী রোমাঁ রোলাঁরের মতে, শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন 'ভারতের মহান ঋষিকুলের শেষ ঋষি'। ঋষি অরবিন্দ নিজের দিব্যদৃষ্টিতে ভারতবর্ষের যে 'নবজন্ম' দেখেছিলেন, তাঁর সঞ্জীবনী শক্তির উৎস সম্পর্কে বলেছেন...

'একটি কথা এখানে স্মরণে রাখিতে হইবে এবং অনেকেই ন্যায়তঃ এ কথাটির উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাহা এই যে, ভারত চিরদিনই এমনকী জাতীয় জীবনের ঘোর অবসাদের মধ্যেও, অক্ষত রাখিয়াছে তাহার অধ্যাত্ম প্রতিভা। এই বস্তুটিই ভারতকে রক্ষা করিয়াছে ভারতের প্রত্যেক সন্ধি-মুহূর্তে আর আজকের যে নবজন্ম দেখা দিয়েছে, তাহারও গোড়ার অনুপ্রেরণা ওই বস্তুটির মধ্যে' (ভারতের নবজন্ম)। আজ আমরা যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব পালন করছি; সেই সময় 'বিশ্বগুরুর' আসনে স্থান পেতে ঋষি অরবিন্দের দর্শনের উপলব্ধি ও রূপায়ণ একান্ত আবশ্যক। ঋষি অরবিন্দ স্বচক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দেখেছিলেন কিন্তু তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে যে 'আর্যশিক্ষার উত্থান' দেখেছিলেন তা বাস্তবায়নের সংকল্পই তাঁর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্তির শ্রদ্ধাঞ্জলি হোক। □

মৌনমুখর শিল্প সৃজনে মাইম থিয়েটার

কৃষ্ণচন্দ্র দে

মানব সভ্যতার গোড়া থেকেই নাটকীয় ভাবনার অঙ্কুরোদ্গম মানুষের হৃদয়ে রয়েছে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা নির্মাণ হয় এবং কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটতে থাকে নানা নাট্য ভাবনার। অন্তত প্রথম যুগের প্রাচীনতম দলিল তাই বলছে। পৃথিবীতে প্রাণের সঞ্চার হওয়া থেকে সভ্যতার আদিপর্বে কোনও না কোনও রূপে প্যান্টোমাইম ব্যবহৃত হয়েছে। আদিম যুগে নৃত্যকলা, চিত্রকলা, লোকসংগীত, উল্কি, সাজসজ্জা ও বিনোদন সবেতেই প্যান্টোমাইম বা মূকাভিনয়ের প্রভাব ছিল।

প্যান্টোমাইমের এই ব্যবহারই পরবর্তীকালে সৃজনশীল মানুষকে নৃত্য ও সংগীতের সৃষ্টিতে আকর্ষিত করে। তাই প্যান্টোমাইম বা মুকাভিনয় নিঃসন্দেহে আদি শিল্পকলা। মানুষ যখন কথা বলতো না, অর্থাৎ তার মুখে যখন বুলি ফোটেনি, তখনও সে কথা বলতো, তবে আকারে, ইঙ্গিতে, ইশারায়, নানা চিহ্ন, প্রতীক, মোটিফের মাধ্যমে। এটাই মুকাভিনয়। জীবনের এই ঘনিষ্ঠতার কারণেই আজও এই প্রাচীনতম শিল্পের সরব উপস্থিতি।

এই মূকাভিনয় প্রসঙ্গেই আজ এমন একজনের কথা বলবো যিনি এই নীরব শিল্পকলাকে এক নতুন আঙ্গিক দিয়ে উপস্থাপনা করেছেন যা অনেকটাই প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো। সেখানে আবহ, আলো, স্ক্রিপ্ট, মঞ্চসজ্জা, কস্টিউম সব কিছুই বর্তমান থাকে, শুধু কথা বা সংলাপ শোনা যায় না, যা অনেকটা নির্বাক চলচ্চিত্রের মতো। এই শিল্পীর নাম সোমা দাস। সোমা মাইম থিয়েটারের কর্ণধার। Pantomime is the grand father of modern theatre— গর্বের সঙ্গে একথা তিনি বলেন বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে। মাইম শিল্পের ধারাটাই বদলে দিয়েছেন সোমা দাস তার ভাবনা চিন্তার সংমিশ্রণে। বিখ্যাত মাইম শিল্পী পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামীর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এই শিল্পকলাকে নতুন ভাবে নতুন আঙ্গিকে একেবারে নতুন ধারায় দর্শকের সামনে হাজির করেছেন। গতানুগতিক যে ধারা মাইমের ক্ষেত্রে দেখা যায় মুখে সাদা রং, চোখে কালো বর্ডার এবং সাদা বা কালো পোশাকে বিভিন্ন ঘটনার বা কাহিনির নির্বাক চিত্রকল্প তৈরি করে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করা, সেই গতানুগতিক ধারা বা প্রথাকে সরিয়ে রেখে একেবারে প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো প্রপস্ পোশাক, মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ সংগীতের সহযোগে অভিনয় উপস্থাপনা করা। সংলাপ শোনা না গেলেও অভিনয়ের দক্ষতা, শরীরী ভাষা, অভিব্যক্তির প্রসাদগুণে দর্শকবৃন্দ সবই বুঝতে সক্ষম হন। কাজটা অত্যন্ত দুরূহ বটে।

দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্য সবচেয়ে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সংলাপ। কিন্তু এই শিল্পকলায় সংলাপের কোনো জায়গা নেই, সেজন্য শিল্পীদের অনেকটাই দক্ষ হতে হয়। বিশেষ দক্ষতা ছাড়া এই মৌনমুখর কলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

প্রয়াত মাইম শিল্পী পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামীর আশীর্বাদ নিয়ে ২০১৫ সালে সোমা পথ চলা শুরু করেন। সোমার মাইমের জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে উঠে গেছে। সোমা দাসের অবিস্মরণীয় অভিনয়, বিনা সুতোয় মালাগাথার দক্ষতা, নিখুঁত সেলাই দৃষ্টান্তমূলক উপস্থাপনা, সব কিছু মিলিয়ে নির্দেশক হিসেবেও সোমা দাস সার্থক। সোমার সার্থকতার পিছনে তাঁর দীর্ঘ অধ্যবসায়। বাবা মানিক মজুমদার স্বনামধন্য মূকাভিনয় শিল্পী ছিলেন। বাবার কাছেই তাঁর এই শিল্পের হাতেখড়ি। ২০১৭ সালে ভারত সরকারের সংগীত নাটক অ্যাকাডেমির উস্তাদ বিসমিল্লা খান যুব পুরস্কারে ভূষিত সোমা বর্তমানে জাতীয় স্তরের শিল্পী ও শিক্ষক। ২০০৩ সালে ন্যাশনাল সিনিয়র স্কলারশিপ পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার এবং ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব মাইমের তিনি অতিথি প্রশিক্ষক। ছক ভেঙে মাইমের মান ও মূল্য বাড়াতে মরিয়া সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে মূকাভিনয়কে জনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে চলেছে সোমা মাইম থিয়েটার। কাজের জন্য দেশে বিদেশে স্বীকৃতির। তার মধ্যে গৌরব ভোকেশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯, ন্যাশনাল ২০০২-স্কলারশিপ, স্পোর্ট অ্যান্ড কালচার মন্ত্রক দপ্তর দিল্লি। ন্যাশনাল জুনিয়ার স্কলারশিপ ২০১৮, সংস্কৃতিমন্ত্রক দিল্লি। তৃপ্তিমিত্র স্কলারশিপ ১৯৯৩ প্রথম শিশু ওয়ার্কশপ (১৯৯৩) যুব উৎসবে ডিস্ট্রিক্ট লেবেলে প্রথম, স্টেট লেবেলে দ্বিতীয় পুরস্কার। প্রদর্শিত অভিনয়— ঢাকি, উদয়ন, আইকন, শহরে পান্তাবুড়ি, জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণ, অমৃতস্য পুত্রা, আমার জন্মভূমি, রোজগেরে গিন্নিতে সালুন চরিত্রে। সাঁকো, অহম নারী, শক্তিরূপেণ, আগমনীর আসর, আবাহনের পথে এবং প্রেম, অভিনেত্রী, অন্দরমহলের কথা, বেঁচে থাকার ঘ্রাণ প্রভৃতি। বর্তমানে সোমা দক্ষিণ কোরিয়ার সিওল শহরে ব্যস্ত আছেন তার মূকাভিয়ে প্রদর্শনে। ☐

লোকশিক্ষা

ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য

এক ছিলেন রাজা আর তাঁর এক মন্ত্রী। মন্ত্রী খুব ঈশ্বর বিশ্বাসী ছিলেন। ভগবানের প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস। কোনো কথা হলেই মন্ত্রী বলতেন 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন'। একদিন রাজার ছেলে মারা গেল। সে খবর শুনে মন্ত্রী বললেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। একথা কানে যেতেই রাজা খুব রেগে গেলেন। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কয়েক বছর পর রানি মারা গেলেন। একথা শুনেও মন্ত্রী বললেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। এবারও রাজা খুব রাগ করলেন। কিন্তু চুপ করে থাকলেন। কিছুদিন পর এক কর্মকার একটা সুন্দর তলোয়ার তৈরি করে এনে রাজামশাইকে উপহার দিল। রাজামশাই খুশি হয়ে তলোয়ারের ধার পরীক্ষা করার জন্য যেই না আঙ্গুল দিয়েছেন অমনি তাঁর কড়ে আঙ্গুলটি কচ করে কেটে পড়ে গেল। সবাই হায় হায় করতে লাগল। মন্ত্রীমশাই পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, বলে উঠলেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ব্যাস, আর যায় কোথায়! রাজার এতদিনের জমে থাকা রাগ দপ্‌ করে জ্বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিলেন, 'এখনই আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যান। আপনার মুখ দর্শন করব না।' মন্ত্রীর এবারও সেই এক কথা— ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। মন্ত্রীমশাই রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন।

এরপর কয়েক বছর কেটে গেছে। এসব কথা সবাই ভুলে গেছে। রাজা একদিন পাত্র-মিত্র নিয়ে শিকার করতে বনে গেলেন। জঙ্গলে একটা বুনো শুয়োরের পিছু ধাওয়া করতে করতে গভীর জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন। তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেক পেছনে পড়ে রইল। রাজা পথ হারিয়ে ফেললেন।

ওই জঙ্গলে থাকত একদল ডাকাত। তারা সেদিন ঠিক করেছে মা কালীর সামনে সর্ব সুলক্ষণযুক্ত মানুষ বলি দেবে। চারিদিকে তাই মানুষের খোঁজ চলছে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। জঙ্গলে অন্ধকার নেমেছে। মশাল হাতে ডাকাতরা ঘুরছে। পড়বি তো পড় রাজা তাদের সামনে গিয়ে পড়লেন। ডাকাতরা তো বেজায় খুশি। একজন সুপুরুষ পেয়ে গেছে। তারা রাজাকে ধরে মা কলীর সামনে নিয়ে এল। বলিদানের সব ব্যবস্থা তৈরিই ছিল। ডাকাতদের পুরোহিত বলল – নিয়ে এস লোকটাকে। দুজন ডাকাত রাজাকে নিয়ে এল। পুরোহিত রাজাকে জিজ্ঞেস করল— তোমার ছেলে বেঁচে আছে? রাজা বললেন, অনেকদিন আগেই মারা গেছে। পুরোহিত বলল এ তো জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। আবার জিজ্ঞাসা করল— তোমার স্ত্রী বেঁচে আছে? রাজা বললে, না, সেও অনেকদিন হলো মারা গেছে। পুরোহিত বলল এ লোকটা অর্ধ অঙ্গের মানুষ। পুরোহিতের সন্দেহ হলো লোকটা বুঝি মরার ভয়ে মিথ্যা কথা বলছে। তখন সে রাজার সারা শরীর পরীক্ষা করতে লাগল। রাজার একটা আঙ্গুল কাটা দেখে পুরোহিত বলল লোকটার একটা আঙ্গুল কাটা! এ তো নিখুঁত নয়। মা কালীর সামনে একে বলি দেওয়া যাবে না। নিরাশ হয়ে পুরোহিত তখন রাজাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য লোকের খোঁজ করতে বলল।

রাজা ছাড়া পেয়ে সোজা রাজধানীকে ফিরে এলেন। এসেই আদেশ দিলেন— যাও আমার মন্ত্রীকে যেখানেই পাও খুঁজে নিয়ে এস। মন্ত্রী না আসা পর্যন্ত আমি অন্ন-জল গ্রাহণ করব না। চারিদিকে লোক পাঠানো হলো মন্ত্রীকে খুঁজে আনার জন্য। মন্ত্রীকে খুঁজে পেতে দেরিও হলো না। সিপাই-সান্ত্রীরা বলল, মন্ত্রীমশাই, আপনাকে রাজামশাই রাজধানীতে ফিরতে বলেছেন। মন্ত্রী শুনেই বলে উঠল— ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন।

মন্ত্রী রাজধানীতে ফিরে এলে রাজামশাই তাকে সসম্মানে নিজের পাশে বসালেন। জঙ্গলের সকল বৃত্তান্ত বলে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, আপনার কথা যথার্থ। আমার ওপর ভগবানের যে এত দয়া তা বুঝতে পারিনি। ভগবানের কৃপায় যদি আমার আঙ্গুল কাটা না যেত তাহলে সেদিন আমার গর্দান কাটা যেত। কিন্তু মন্ত্রীমশাই, আপনাকে যখন তাড়িয়ে দিলাম তখন আপনিও বলেছিলেন ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। সেটা কীরকম? মন্ত্রী বললেন, দেখুন মহারাজ, আপনি শিকারে গেলে আমাকেও সঙ্গে যেতে হতো। আর শিকারের পিছু পিছু আমার ঘোড়াও আপনার কাছাকাছি থাকত। তখন ডাকাতরা আমাদের দুজনকেই ধরে নিয়ে যেত। আপনি তো আঙ্গুল কাটা বলে বেঁচে যেতেন, কিন্তু আমার দশা কী হতো? আমার গলাটি কাটা যেত। ভগবানের দয়ায় তার আগেই আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই বেঁচে গেলাম। আবার আপনার কাছে ফিরেও এলাম। মহারাজ, এ ভগবানের অশেষ দয়া ছাড়া আর কী?

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের বিপ্লবী

সতীন্দ্রনাথ সেন

সতীন্দ্রনাথ সেন প্রখ্যাত বিপ্লবী ও জননেতা। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগ দেন। ১৯১৫ সালে কৃষ্ণনগরের কাছে রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশ পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেও ভারত রক্ষা আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার হন। মুক্তির পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশাল- পটুয়াখালি সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ইউনিয়ন বোর্ড কর-বন্ধ আন্দোলনও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। কয়েকবার তিনি অনশন করেন। বহুবার কারাবরণ করেন। দেশভাগের আগেই পূর্ব পকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। ১৯৫৫ সালের ২৫ মার্চ রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়।

জানো কি?

- নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীকে ভারতে ফুটবল খেলার জনক বলা হয়।
- ভারতে প্রথম ফুটবল ক্লাব ‘ক্যালকাটা-এফসি’। ১৮৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- প্রথম বাঙ্গালি ফুটবল রেফারি পঙ্কজ গুপ্ত।
- ব্রিটিশ ভারতের জাতীয় ফুটবল ক্লাবের নাম মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।
- ফুটবল খেলায় গোলপোস্টের উচ্চতা হয় ৮ ফুট।
- ফুটবল রেফারিদের কুপার টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হয়।
- ফুটবল খেলায় দুটি গোলপোস্টের মধ্যে ২৪ ফুট দূরত্ব থাকে।

ভালো কথা

কৃষকবন্ধু দাঁড়াস সাপ

আমাদের ধানের গোলায় বহু ইঁদুর বাসা বেঁধেছিল। খুব ধান নষ্ট হচ্ছিল। ইঁদুরগুলোকে কিছুতেই তাড়ানো যচ্ছিল না। গোলার পেছনের পুকুরে থাকা দাঁড়াস সাপগুলোও ইঁদুর খেতে আসছিল না। একদিন দাদাই কার কাছ থেকে শুনেছে যে সিমেন্টর প্লাস্টারের উপর দিয়ে সাপ চলতে পারে না। তাই ইঁদুর ধরতে পারছে না। তারপর দিন দাদাই শাবল দিয়ে পুকুরের দিকের প্লাস্টার উঠিয়ে দিতেই একরাতেই সব ইঁদুর শেষ। দাদাই বলল, সাপের প্রিয় খাদ্য ইঁদুর, বুঝলি? শুধু তাই নয়, সাপ হলো কৃষকের বন্ধু।

কুমুদ রায়, অষ্টম শ্রেণী, করদহ, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) ত্যু ল অ মৃ

(২) ত্যা ধু ক নি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) ন অ বো কা ধ ল

(২) ল হ ম র ন্দ অ

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) রাখিবন্ধন (২) রাজমুকুট

২২ আগস্ট সংখ্যার উত্তর

(১) প্রধানশিক্ষক (২) প্রথমদর্শন

উত্তরদাতার নাম

(১) রমহরি সেন, ঝালদা, পুরুলিয়া (২) সায়নী দাস, বারুইপুর, দ: ২৪ পরগনা
(৩) দিবম বর্মন, হলদিবাড়ি, কোচবিহার (৪) স্নেহময় রায়, নিউ ব্যারাকপুর, উ: ২৪ পরগনা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

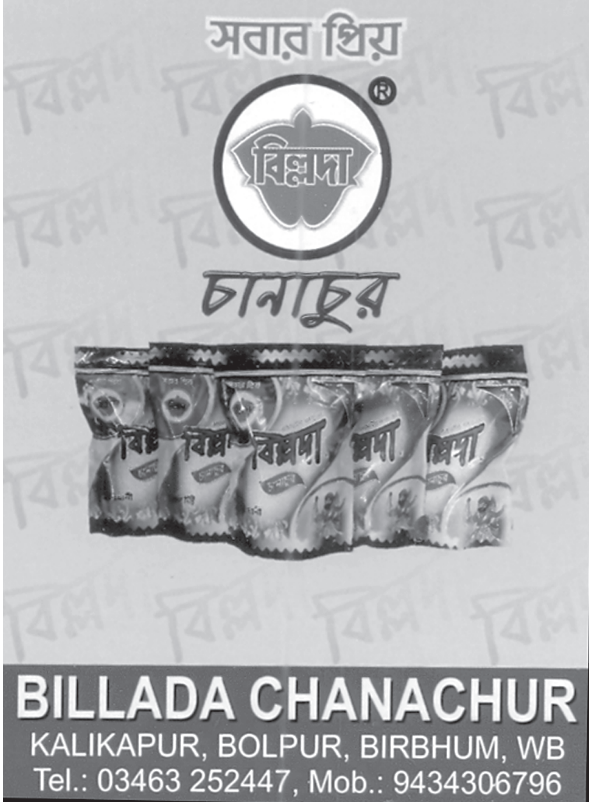

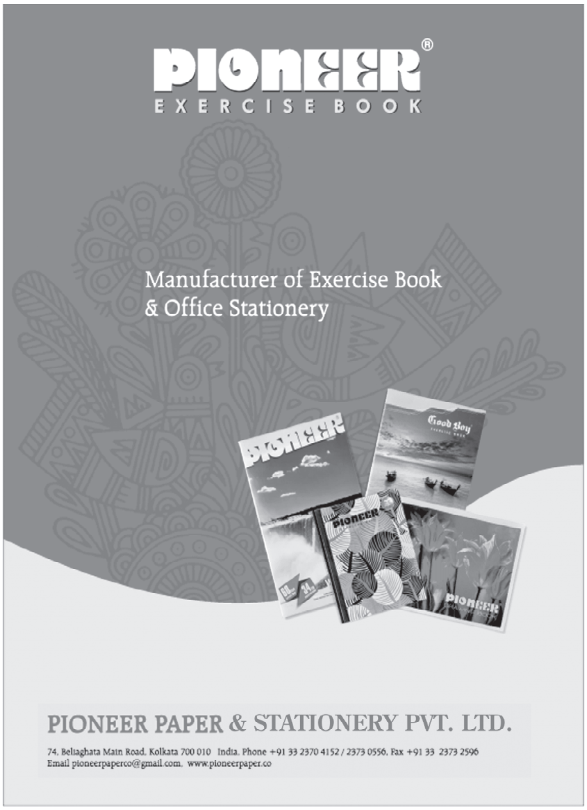

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব
কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

আত্মনির্ভর ভারতের উজ্জ্বল উদাহরণ ব্রহ্মোস মিসাইল

দিব্যেন্দু বটব্যাল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছিলেন তখন অনেকেই হাসিঠাট্টা করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, এই প্রকল্প ঘোষণা করে সারা বিশ্বকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে ভারত এখনও আত্মনির্ভর হতে পারেনি। সত্যি কথা বলতে এই যুক্তিতে কোনও ভুল নেই। স্বাধীনতার পর প্রায় সাড়ে সাত দশক কেটে গেলেও ভারত যে আত্মনির্ভর হতে পারেনি তার প্রমাণ ভারতের আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ফারাক। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। যে ওষুধশিল্প নিয়ে ভারত গর্ব করে তার ৭০-৮০ শতাংশ কাঁচামাল এখনও চীন থেকে রপ্তানি করতে হয়। কেন হয় সেটা যারা দীর্ঘকাল কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিলেন তারা বলতে পারবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা যে যথেষ্ট বাস্তবসম্মত তা বলাইবাহুল্য।

আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর।

ইদানীং অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর নিন্দুকদের সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব বেশি দেখা যাচ্ছে না। তার কারণ আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প ইতিমধ্যেই সোনার ফসল ফলাতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মিসাইল, যুদ্ধবিমান, এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ও অন্যান্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে ভারত অনেকদূর এগিয়ে গেছে। একটা সময় ছিল যখন ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান অস্ত্র আমদানিকারী দেশ হিসেবে গণ্য হতো। কিন্তু এখন ভারত বিশ্বের অন্যতম প্রধান অস্ত্র রপ্তানিকারী দেশ। যার ছাপ পড়েছে ভারতের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যেও। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের মোট রপ্তানি ৪২০ বিলিয়ন ডলার ছাপিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন চলতি অর্থবর্ষে ভারতের জিডিপি ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে। করোনা মহামারীর ফলে অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছিল ভারত তা ভালোভাবেই সামলাতে পেরেছে। কতটা

ফ: ৬

তেজস

ভালোভাবে সামলেছে তা একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। বিশ্বের প্রতিটি দেশই যেখানে করোনা-পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দায় আক্রান্ত— ঠিক এই সময়ে ব্লুমসবার্গ ঘোষণা করেছে ভারতে মন্দার কোনও ছাপ পড়বে না। এর জন্যেও মোদী সরকারের ধন্যবাদ প্রাপ্য। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হবার পর আমেরিকার ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে রাশিয়ার কাছ থেকে ৩০ শতাংশ ডিসকাউন্টে ক্রুড অয়েল কিনে ভারত যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়েছে তাকেই মন্দার হাত থেকে বাঁচার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

তবে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ এবং চীন-তাইওয়ানের যুদ্ধের সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো ভারতের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম নির্মাণে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা। বিশ্বের বাজারে ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইল ও তেজস যুদ্ধবিমান হইচই ফেলে দিয়েছে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিনস, আর্মেনিয়া ইতিমধ্যেই ভারতের কাছ থেকে ব্রহ্মোস মিসাইল কিনেছে। কথা চলছে গ্রিস ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশের সঙ্গে। আমেরিকাও ভারতের তেজস (লিফট সংস্করণ) যুদ্ধবিমান কিনতে চায়। এর জন্য ভালো দাম দেবার প্রস্তাবও দিয়েছে আমেরিকা। আমেরিকা কোনওদিন ভারতের কাছ থেকে ফাইটার জেট কিনতে পারে— এমন দিবাস্বপ্ন পাঁচ বছর আগেও কেউ দেখতেন না। কিন্তু আজ এটা বাস্তব। এদিকে ভারতের তেজস ফাইটার জেটের প্রতি আমেরিকার আগ্রহের কথা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবার পর থেকে বিশ্বের বহু দেশ তেজস কেনার ব্যাপারে কথা বলতে শুরু করেছে। এইসব দেশের মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনা, ইজিপ্ট, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। মালয়েশিয়া ১৮টি তেজস কেনার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছে। এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে তেজস ফাইটার জেটে কী এমন বিশেষত্ব আছে যে বিশ্বের এতগুলো দেশ কেনার জন্য মরিয়া হয়ে উঠল? তেজসের প্রধান বৈশিষ্ট্য এটি অন্যান্য ফাইটার জেটের তুলনায় হালকা। আবার হালকা হওয়া সত্ত্বেও তেজস সুখোইয়ের মতো ভারী ওজন বহনে সক্ষম। ৫২,০০০ ফিট উচ্চতায় তেজস ফুল লোডেড অবস্থায় শব্দের চেয়ে বেশি গতিবেগে উড়তে পারে। তার চেয়েও বড়ো কথা তেজস বিশ্বের বেশিরভাগ আধুনিক এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের নজরদারি এড়িয়ে লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে কেন সারা বিশ্বে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস নিয়ে এরকম মাতামাতি হচ্ছে।

মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই স্বদেশি প্রযুক্তিতে যুদ্ধ-সরঞ্জাম তৈরিতে জোর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অস্ত্র কেনার বহর যেমন কমেছে ঠিক তেমনই নানারকম প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করে ভারত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করেছে। আন্তর্জাতিক বাজার নিয়ন্ত্রণ করার জায়গায় পৌঁছতে পারলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫ ট্রিলিয়ন ইউএস ডলারের অর্থনীতির স্বপ্নপূরণ যে অল্প সময়ের মধ্যেই সম্ভব, সেটা বলাইবাহুল্য। তবে অর্থনীতির প্রয়োজন ছাড়াও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণে ভারতের আত্মনির্ভর হওয়ার অন্য কারণও আছে। রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চলছে গত ছ'মাস ধরে। এদিকে চীন ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনাও দিন দিন বাড়ছে। বিশেষজ্ঞদের অনুমান চীন যদি তাইওয়ান আক্রমণ করে তাহলে তাইওয়ানের সাহায্যার্থে আমেরিকাকে এগিয়ে আসতেই হবে। অর্থাৎ কার্যত যুদ্ধ হবে চীন ও আমেরিকার মধ্যে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে ভারত হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবে না। কারণ যুদ্ধ হবে দুই ফ্রন্টে। এক ফ্রন্টে চীন যুদ্ধ করবে আমেরিকার সঙ্গে। দ্বিতীয় ফ্রন্টে লড়াই হবে ভারত ও চীনের মধ্যে। সম্ভবত অরুণাচল প্রদেশ দখল করার চেষ্টা করবে চীন। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। সুতরাং এই পরিস্থিতিতে সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনও ভারতের দিক থেকে উপেক্ষা করার মতো নয়।

আমেরিকার হাউস-স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান যাত্রার পর থেকেই চীন তাইওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। বস্তুত ন্যান্সি পেলোসি ফিরে যাওয়ার পর তাইওয়ানকে চার দিক থেকে ঘিরে পুরোপুরি যুদ্ধের মেজাজে ড্রিলও করেছে চীনা সেনা। এর উদ্দেশ্য শক্তি প্রদর্শন। ন্যান্সি পেলোসির

তাইওয়ান যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হবার পর চীনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস লিখেছিল, ন্যান্সির বিমান তাইপে এয়ারপোর্টে নামার চেষ্টা করলে চীনা সৈন্য গুলি করে উড়িয়ে দেবে। কার্যক্ষেত্রে সেসব অবশ্য কিছুই করেনি পিপলস লিবারেশন আর্মি। ন্যান্সি তাইওয়ানে এসেছেন, আবার কাজ সেরে ফিরেও গেছেন। ন্যান্সির নিরাপত্তার যে নজিরবিহীন ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার কোনও ছিদ্র খুঁজে পায়নি চীন। তবে আমেরিকা যে শুধুমাত্র ২২টি এফ-১৬ ফাইটার জেটের বেষ্টনীর মধ্যে ন্যান্সির বিমানকে মুড়ে তাইওয়ানে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছে, তা নয়। ন্যান্সি যতক্ষণ তাইওয়ানে ছিলেন ততক্ষণ চীনের পুরো মিসাইল অপারেটিং সিস্টেম আমেরিকা জ্যাম করে দিয়েছিল বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া। যার ফলে চীন কিছুই করতে পারেনি। ন্যান্সি-ইস্যুতে মুখ পোড়াবার পর চীন এখন বদলা নেবার জন্য তাইওয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চায়। চীনের যুক্তি হলো, ন্যান্সির তাইওয়ান যাত্রা চীনের ওয়ান চায়না পলিসির পরিপন্থী। ওয়ান চায়না পলিসি অনুযায়ী তাইওয়ান চীনের অংশ। আমেরিকার হাউজ-স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইওয়ান যাত্রার অর্থ হলো তাইওয়ানকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। এটা চীন কিছুতেই মানবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে আমেরিকা চীনের ওয়ান চায়না পলিসিকে সমর্থন করেছিল। ভারতও একসময় সমর্থন করত। তবে এবার তাইওয়ান দখল করার চীনা নীতি ভারত সমর্থন করেনি। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে ভারত দক্ষিণ চীন সাগর অঞ্চলে কোনও যুদ্ধ চায় না। এই বিবৃতি চীনের আগ্রাসী নীতির বিরোধিতা। ভারত যে আর আগের মতো ওয়ান চায়না পলিসি অন্ধের মতো সমর্থন করবে না, তাও এই বিবৃতিতে স্পষ্ট। বস্তুত আজকের পরিপ্রেক্ষিতে চীনের ওয়ান চায়না পলিসি সমর্থন করার অর্থ অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চীনের দাবিকে সমর্থন করা। চীনকে কোনও অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না। পাকিস্তান, সলোমন আইল্যান্ড ইত্যাদি কয়েকটি দেশ ছাড়া পৃথিবীর কোনও দেশ চীনকে বিশ্বাস করে না। সুতরাং চীনের ওয়ান চায়না পলিসিকে সমর্থন করে ভারত নিজের পায়ে কুডুল মারবে না সেটাই বলাইবাহুল্য।

আই এন এস বিক্রান্ত

এ প্রসঙ্গে রাশিয়ার কথাও বলা দরকার। এ কথা ঠিক যে ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার বহুদিনের বন্ধুত্ব। ভারতের বিপদে অনেকবার রাশিয়া পাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাশিয়ার সঙ্গে চীনের সামান্যই পার্থক্য চোখে পড়বে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন অনেকবার তাঁর বিস্তারবাদী পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এমনকী, তিনি যে স্রেফ সামরিক শক্তির জোরে আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন করতে চান সেই খবরও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বেরিয়েছে। তবে সম্প্রতি পুতিনের মগজ হিসেবে পরিচিত আলেক্সানডার ডুগিনের মেয়ে কায়রার বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যুর পর এসব খবর আরও ডালপালা ছড়িয়েছে। কারণ আজ থেকে অনেকদিন আগেই ডুগিন তার বইয়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। তিনি লিখেছেন, নিজের স্বার্থেই রাশিয়ার উচিত ইউক্রেন দখল করা। শুধু ইউক্রেন নয়, পোলান্ডও দখল করা উচিত রাশিয়ার। কিন্তু তারপর আর এগনো উচিত হবে না। কারণ তাতে দক্ষিণ ইউরোপের শক্তিশালী দেশগুলো এক হয়ে যাবে এবং রাশিয়ার একার পক্ষে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব হবে না। রাশিয়ায় ডুগিন যথেষ্টই প্রভাবশালী। পুতিন তাঁর কথাকে বেশ গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পক্ষে রাশিয়া যে যুক্তি আজকাল দেয় তা সম্পূর্ণ সত্যি নয় বলেই মনে হয়। ইউক্রেন দখল করার পরিকল্পনা রাশিয়ার অনেকদিনের। এই অবস্থায় চীন যদি ভারত আক্রমণ করে তাহলে রাশিয়ার সমর্থন কোনদিকে থাকবে তা আগে থাকতে বলা কঠিন।

ভারতের বিপদ দু'দিকে। একদিকে পাকিস্তান, অন্যদিকে চীন। অগত্যা ভারতকে যুদ্ধের জন্য তৈরি থাকতেই হবে। সমস্যা ঘনিয়ে ওঠার পর সমাধান খোঁজার ভুল ভারত ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে করেছিল। তার খেসারতও দিতে হয়েছিল ভারতকে। কিন্তু আজকের ভারত নতুন ভারত। সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার বুকের পাটা যে তার আছে সেটা সারা বিশ্ব জানে। আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের এই সাফল্য ভারতের প্রতি বিশ্বের সমীহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সমীহই একদিন ভারতকে বিশ্বগুরুর আসন দেবে। ▯

নাসার গবেষণায় ডাক পেল দুর্গাপুরের অপরূপ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মাত্র ১৭ বছর বয়সেই বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর শিরোপা অর্জন করেছে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের অপরূপ রায়। ছোট থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখা এই বিস্ময় কিশোর নিজের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নাসা ও হার্ভার্ডের মতো সংস্থায় গবেষণার জন্য ডাক পেয়েছেন। এই বয়সেই দু'খানা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বিজ্ঞানীমহলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই একাদশ শ্রেণীর পড়ুয়া। আজকের পৃথিবীতে প্লাস্টিক ও তার দূষণ নিয়ে জেরবার মানবসমাজ। এতদিন প্লাসটিকের রূপান্তর নিয়ে চিন্তিত ছিল বিজ্ঞানীরা। তাই সাম্প্রতিককালে প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসতে দেশে দেশে প্লাস্টিকের ব্যবহার বর্জন করার ডাক দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশার আলো দেখিয়েছে অপরূপের গবেষণা। প্লাস্টিককে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ করে বায়ো-প্লাস্টিকে রূপান্তরিত করার বিশেষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, গোবরের ব্যবহার করে প্রাকৃতিক উপায়ে স্বল্পখরচে মশার কীটনাশক তৈরি করে নজির গড়েছেন এই তরুণ। এই দুই অভিনব আবিষ্কারের জন্যই দুর্গাপুরের অপরূপের সঙ্গে গবেষণা করার প্রস্তাব দিয়েছে আমেরিকার নাসা।

দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে পড়ে অপরূপ। থাকে গোপালপুরমাঠ গ্রামে। খুব ছোট থেকেই তাঁর স্বপ্ন একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী হওয়ার। গবেষণা করার। সেই লক্ষ্যেই ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকেই মানুষের প্রতিদিনের জীবনে সমস্যামূলক বিষয়গুলির সমাধান নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন তিনি। তারপর সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গবেষণার কাজে হাত দেন। অপরূপের গবেষণালব্ধ বায়ো ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক ও মশা মারার গোবরজাত রাসায়নিক ওষুধের আবিষ্কারই তাঁকে খুদে বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বায়ো-প্লাস্টিকের আবিষ্কার নিয়ে অপরূপ জানান, "প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে চারদিকে যেভাবে দূষণ বাড়ছে এবং নিকাশি ব্যবস্থা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে আমি প্লাস্টিককে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংশ্লেষণ করে সেটিকে বায়ো প্লাস্টিকে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছি। এই বায়ো-প্লাস্টিক ১-২ মাসের মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। সরকার যদি এই বায়ো-প্লাস্টিক বৃহত্তম ক্ষেত্রে উৎপাদন করে তাহলে ভারত উন্নতির একটি শিখরে পৌঁছবে।"

অন্যদিকে কম খরচে মশা মারার ওষুধ তৈরি নিয়ে দুর্গাপুরের তরুণ বলেন, " গ্রামে আমি দেখেছি, অনেকে ঘুঁটে ইত্যাদি ব্যবহার করে মশা তাড়ায়। সেই ভাবনা থেকেই আমি গোবর নিয়ে রিসার্চ করে একটি মশা তাড়ানোর কীটনাশক তৈরি করেছি। " অপরূপের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব সায়েন্স অব রিসার্চ থেকে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হবার পরই আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (নাসা)-এর কেন্দ্রীয় দফতর থেকে একটি ই-মেল পাঠানো হয় অপরূপকে। সেখানে তাঁকে নাসা'র সঙ্গে কাজ করার অফার দেয় তারা।

এত পরিচিতি, স্বীকৃতির পরেও থেমে নেই অপরূপ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইতিমধ্যেই সহজ-সরল ভাষায় লিখে ফেলেছেন রসায়নের দুটি বই। 'প্রবলেমস ইন জেনারেল কেমিস্ট্রি' ও 'মাস্টার আইসিএসই কেমিস্ট্রি : সেমেস্টার ১ ও ২'। বই দুটি স্কুলে স্কুলে সহায়ক পাঠ্য হিসেবে একদিন গৃহীত হবে বলে আশাবাদী অপরূপ।

স্কুলে শিক্ষক ও সহপাঠীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় এই খুদে বিজ্ঞানী। সহপাঠীদের কাছে তিনি মুশকিল আসান। কারও কোনও ডিফারেন্সিয়াল ইন্টিগ্রেশনের অঙ্কের সমাধান না মিললে অপরূপ নিমেষে তার সমাধান করে দেন। পরপর আবিষ্কার, বই লেখা, দুরূহ অঙ্কের সমাধান করে ভারতের সর্বকনিষ্ঠ বিজ্ঞানীর সম্মান অর্জন করেছেন অপরূপ। অঙ্কের অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধান করার পর কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাথামেটিক্যাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর নাম। সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে 'মিনি পিএইচডি' প্রোগ্রামে গবেষণা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাঁকে।

এত অল্প বয়সে এত অ্যাচিভমেন্টের পরেও আর পাঁচটা সাধারণ পড়ুয়ার মতোই তাঁর জীবন যাপনের ধরন। তাঁর বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার। প্রথাগত পড়াশোনার চাপ সামলেও সমান তালে অনলাইনে নাসার হয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অপরূপ। যদিও এই কাজের জন্য কোনও পারিশ্রমিক নেন না। তাঁর ইচ্ছা, একদিন ইসরোর হয়ে কাজ করবেন তিনি। জন্মভূমি ভারতের জন্য কাজ করার আগ্রহ তাঁর ছোটবেলা থেকেই।

বাঙ্গালি হিসেবে তাঁর কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'প্রাইড অব বেঙ্গল' পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে। পেয়েছেন 'ক্রাউন অব এক্সেলেন্স' পুরস্কার, যে সম্মান এখনও পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক ভারতীয়কেই দেওয়া হয়েছে। ইসরো আয়োজিত সাইবারস্পেস প্রতিযোগিতায় দেশের মধ্যে ১১ র‍্যাঙ্ক করেছেন অপরূপ। ইতিমধ্যে একসঙ্গে নাসা, ইএসএ এবং জাক্সার হেক্সাটন প্রোজেক্টে কাজ করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তাঁর কথায় "বিজ্ঞান হলো সাধনা। গবেষণা তার পুজো। আজীবন সাধনার মাধ্যমেই বিজ্ঞানী জন্ম সার্থক হবে আমার। সেই পথে স্বীকৃতি, পুরস্কার উৎসাহ। আমি আরও এগিয়ে যেতে চাই।" ❑

জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে টিবি শনাক্তকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের টিবি বিভাগ ২৪ আগস্ট নতুন দিল্লির জাতীয় জনজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় কনক্লেভের আয়োজন করে। 'জনজাতি টিবি উদ্যোগ'-এর আওতায় ১০০ দিনের আশ্বাসন প্রচারাভিযান চালানো স্থির হয়েছে। দেশের ১৭৪টি জনজাতি অধ্যুষিত জেলায় টিবি রোগের সক্রিয় রোগী শনাক্তকরণের জন্য এ বছর ৭ জানুয়ারি থেকে আশ্বাসন প্রচারাভিযান শুরু হয়েছে। মহারাষ্ট্রের নান্দুরবার জেলা থেকে এই অভিযান শুরু হয়। এ পর্যন্ত ৬৮ হাজার ১৯টি গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিবি রোগের জন্য পরীক্ষা চালানো হয়েছে। মৌখিক পরীক্ষা করা হয় ১ কোটি ৩ লক্ষ ৭ হাজার ২০০ জনের। এর মধ্যে ৭৩ শতাংশ নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। সেখান থেকে ৯ হাজার ৯৭১ জন টিবি রোগ শনাক্ত হয়। তাদের ভারত সরকারের নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা শুরু হয়েছে। অনুষ্ঠানে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব ড. নভলজিৎ কাপুর বলেন এই প্রচারাভিযানকে সফল করতে প্রায় ২ লক্ষ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, তথ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে দেশের জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের শ্বাসযন্ত্রের রোগ ও টিবি রোগের প্রবণতা বেশি মাত্রায় রয়েছে। তিনি সব রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরকে টিবি রোগ দূর করার জন্য পরিকাঠামোগত উন্নয়নের আহ্বান জানান। কেন্দ্রীয় টিবি বিভাগের ডিডিজি বিবেকানন্দ গিরি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইউএসএআইডি-র স্বাস্থ্য বিষয়ক নির্দেশক শ্রীমতী সংগীতা প্যাটেল জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে থেকে টিবি রোগ নির্মূল করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

তৃণমূল দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে বন্ধ হচ্ছে কারখানা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্যে দুষ্কৃতীদের জুলুমে আবার আক্রান্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান। যার জেরে বন্ধ হতে চলেছে আরও একটি কারখানা। হুগলীর সুগন্ধায় একটি মশারি প্রস্তুত কারখানার দখল নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। সেখানে ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না কারখানার মালিককে। এক তৃণমূল নেতার নির্দেশেই দুষ্কৃতীরা কারখানাটিকে বন্ধ করার তোড়জোড় করছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। হুগলী জেলার চুঁচুড়া সদর মহকুমার পোলবা-দাদপুর ব্লকের সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্বপাড়ায় রয়েছে একটি মশারির কারখানা। কারখানার মালিক শিল্পপতি তাপস হালদারের অভিযোগ, স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতী ওই কারখানার দখল নিয়েছে। তাঁকে কারখানায় ঢুকতেই দেওয়া হচ্ছে না। আর এসবই নাকি হচ্ছে স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়। তাঁর কারখানা যাতে দখলমুক্ত হয় তার জন্য শাসকদলের বিভিন্ন নেতার কাছে গিয়ে তদ্বির করেছেন তাপসবাবু। কিন্তু সুরাহার কোনও পথ তিনি এখনও পাননি।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০০৮ সালে রাজ্য শিল্প নিগমের কাছ থেকে তাপসবাবুর সংস্থা ১০ বিঘা জমি লিজ পান। ২০১২ সালে তিনি সেখানে মশারি তৈরির কারখানা চালু করেন। স্থানীয় ৪০ জন বাসিন্দা সেখানে কাজও পান। কারখানা ভালোই চলছিল। কোভিডের কারণে লকডাউনের পর ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়। কারখানা বন্ধও করে দিতে হয় কিছুদিন। সম্প্রতি সেই কারখানা পুনরায় চালু করতে গিয়েই তাপসবাবু দেখেন তাঁর কারখানার দখল নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। মুখ্যমন্ত্রী যখন বারবার শিল্পবান্ধব রূপে পশ্চিমবঙ্গের ইমেজ তুলে ধরতে চান, সেই সময়ে দুষ্কৃতীর দৌরাত্ম্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়া শাসকদলের ব্যর্থতার দিকেই আঙুল তোলে।

সুগন্ধা পূর্বপাড়ার হালদার নেটিংস প্রাইভেট লিমিটেড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুজোর মুখে সমস্যায় পড়েছেন শ্রমিকরা। এক শ্রমিক জানান, ''লকডাউনে কাজ বন্ধ থাকলেও তাপসবাবু আমাদের মাইনে দিয়েছেন। কিন্তু এখন এলাকার তৃণমূল গুন্ডারা কারখানাটা দখল করে নিল। পুজোর মুখে কাজ বন্ধ থাকলে বউ-বাচ্চাদের আমরা খাওয়াব কী?'' যদিও জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেস এমনকী পুলিশও এ বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ। তাঁদের দাবি এই ধরনের কোনও ঘটনার কথা তাদের জানা নেই। স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার জানিয়েছেন, ''বিষয়টি আমার জানা নেই। আমি খোঁজ নিচ্ছি। যদি দেখি এই ঘটনা ঘটেছে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।''

ভারতীয় বিমান বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ র‍্যাডার কেন্দ্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ ২৯ আগস্ট ভারতীয় বিমান বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ র‍্যাডার কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তাঁকে সুসংহত এয়ার কম্যান্ড ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনাটি দেখানো হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনীর জন্য এই ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে বিমান বাহিনীর সদস্যদের সেন্সর-টু-শুটার লুপ-এর সমস্যা হ্রাস পায় এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির যথাযথভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। এই কেন্দ্রের সাহায্যে দেশ জুড়ে বিমানবাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত হয়।

সফরকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেটওয়ার্ক পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে জানানো হয়। এর মধ্যে যুদ্ধবিমান, পণ্যবাহী বিমান এবং দূরসঞ্চার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বিমানগুলির সমন্বিত পরিচালন পদ্ধতিও রয়েছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিমানবাহিনীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রী সিংহকে অবগত করা হয়। সারা বছর ধরে দেশের আকাশপথকে নিরাপদ রাখার জন্য বিমানবাহিনীর যোদ্ধারা যেভাবে কাজ করে চলেছেন, শ্রী সিংহ তাঁদের সেই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার পোশাক ও হোসিয়ারি শিল্পে গতি আনতে উদ্যোগ কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পোশাক ও হোসিয়ারি শিল্পের সহজ ব্যবসা- বাণিজ্যের জন্য উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর ২০১১ সালের প্যাকেটজাত সামগ্রীর আইনি পরিমাপগত নিয়মাবলীতে সংশোধন এনেছে। এর ফলে, খুচরো সামগ্রী বিক্রির ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। গ্রাহকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করলেই এইসব সামগ্রী বিক্রি করা যাবে। এখন থেকে পোশাক ও হোসিয়ারি শিল্পের প্যাকেটজাত সামগ্রীর জন্য অভিন্ন বা জেনেরিক নাম, সামগ্রীর মোট ওজন, একক সামগ্রীর মূল্য ঘোষণা, কবে সংশ্লিষ্ট সামগ্রীটি তৈরি করা হয়েছে সে বিষয়ে তথ্য, কোন সময়ের মধ্যে এটি ব্যবহার করতে হবে এবং গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আবেদনের নিরিখে এই পরিবর্তন করা হলো। বর্তমানে উৎপাদক সংস্থা, বাজারজাতকারী সংস্থা, আমদানিকারকের নাম ও ঠিকানা, গ্রাহক পরিষেবার ই-মেল ঠিকানা ও ফোন নম্বর, সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে পরিমাপ এবং সর্বোচ্চ খুরচো মূল্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রাহকদের দিলেই চলবে।

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৯

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

দেবী প্রসঙ্গ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

উপন্যাস

প্রবাল - বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে ● **এষা দে** - একটি কাল্পনিক কাহিনি

সুমিত্রা ঘোষ- স্বপ্ন ধরার জন্য

জীবনের কথা

বিজয় আঢ্য

পুরাণ

ড. জয়ন্ত কুশারী

বড়ো গল্প

সন্দীপ চক্রবর্তী - বাঁধন

গল্প

শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তাস্য যশ, নিখিল চিত্রকর, সিদ্ধার্থ সিংহ

প্রবন্ধ

রঙ্গাহরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, প্রবীর আচার্য, সুজিত রায়,
সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুজিত ঘোষ

আপনার কপি আজই বুক করুন।। দাম : ৭০.০০ টাকা

ACHEIVEMENT FOR PROPER IMPLEMENTATION OF PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA (PMAY-U) FOR UPLIFTMENT OF LIVING STANDARD TO THE URBAN POOR OF AMBASSA MUNICIPAL COUNCIL DURING THE YEAR 2020-21 & 2021-22

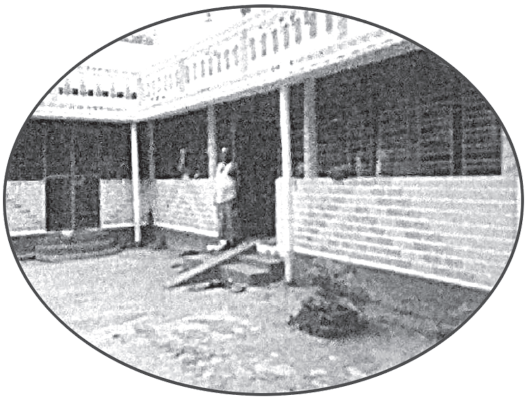

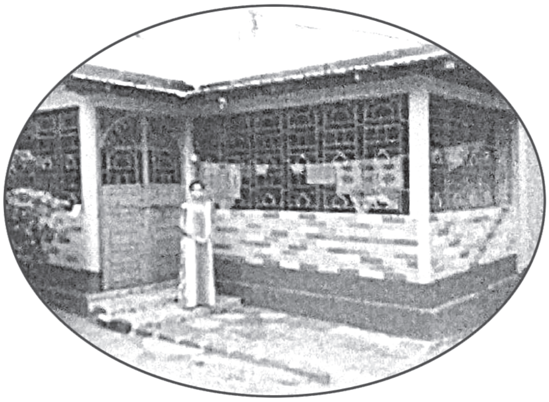

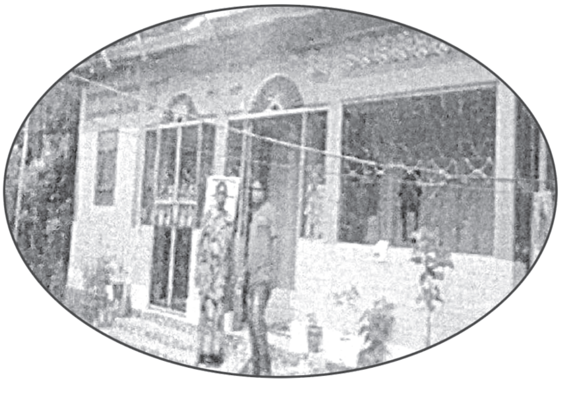

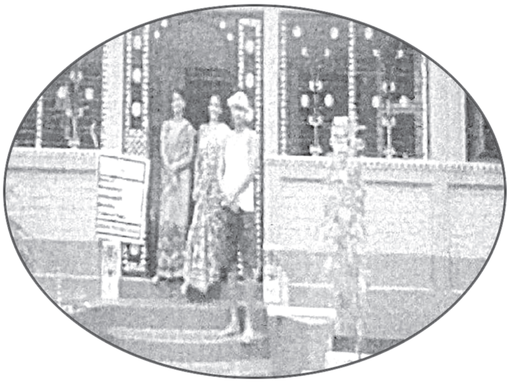

Total Houses Provided - 3114 Nos
Completed Houses - 2235 Nos

Courtsey : Ambassa Municipal Council